বাতায়ন

ভালবেসে

ঈশ্বর আর প্রেমিকের সংলাপ

– 'উড়বে ? – আচ্ছা, ছিড়ে দেয় যদি পাখা ?'
পড়তে পড়তে ধরে নেবো ওর শাখা

– 'যদি শাখা থেকে নীচে ফেলে দেয় তোকে ?'
কী আর করব, জড়িয়ে ধরব ওকেই

বলো কী বলবে, আদালত, কিছু বলবে কি এরপরও ?
– 'যাও, আজীবন অশান্তি ভোগ করো ।'

– জয় গোস্বামী

একাদশ সংখ্যা, মার্চ ২০১৮

সম্পাদনা

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

বাতায়ন

Issue Number 11 : March, 2018

EDITORS

Ranjita Chattopadhyay, IL, USA
Jill Charles, IL, USA (English Section)

COORDINATOR

Manas Ghosh, Kolkata, India

DESIGN AND ART LAYOUT

Kajal & Subrata, Kolkata, India

WEBSITE DESIGN AND SUPPORT

Susanta Nandi, India

PUBLISHED BY

BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

PRODUCTION & MANAGEMENT

Anusri Banerjee

PHOTO & ART WORK CREDIT

Sumit Roy, IL, USA — Front Cover: Art Work

A passionate artist from my early childhood and has an intense passion for art. I am a perfectionist and work hard to give my artworks look at its best. In my art, I like to capture the beauty of the subjects. I am self-taught and consider myself as a lifelong learner and open-minded to experiment with new mediums and techniques.

Tirthankar Banerjee — Inside Front: Porongurup, WA
Perth, Australia — Back : Victoria Memorial, Kolkata

His interest in photography started in student days. Much later the long nights in the dark-room were replaced by hours behind the computer and focus shifted from Black & White to Colour. He likes to show the images as they are and does not approve of computer gimmickry. He loves nature – flowers, birds, trees and all things beautiful. Tirthankar is an engineer, specializing in Renewable Energy and lives and works in Perth, Western Australia.

Kathy Powers — Back Inside Cover: Pigeons

I am a civil rights activist who developed my passions from coping with bipolar disorder symptoms. I have a tagline: "Advocacy is my therapy." Through advocacy I have discovered truth and beauty in helping people and sharing art.

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

The Sun Never Says

Even after all this time
The sun never says to the earth,
"You owe me."

Look what happens
With a love like that,
It lights the whole sky.

— Hafiz, translation by Daniel Ladinsky

'সখী ভালবাসা কারে কয় ?' এই প্রশ্ন কাকে না ভাবিয়েছে ? জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রায় সব ভাষার সব কবি লিখেছেন প্রেমের গান, কবিতা । গল্পকারেরা লিখেছেন ভালবাসার গল্প । বসন্তের রংবাহারী ফুলের মতো ভালবাসার নানা রঙ, নানা গন্ধ । প্রেম কখনও বাঁধভাঙা বন্যার মতো এক অনুভূতি যা যুগে যুগে ঝড় তোলে লায়লা-মজনু, রোমিও-জুলিয়েট বা দুষ্মন্ত-শকুন্তলাদের বুকে । আবার কখনও তা ফল্গুধারার মতো নিঃশব্দে সঞ্চারমান প্রেমিক হৃদয়ে । সময়ের সাথে সাথে অন্য অনেক কিছু বদলে গেলেও বদলায়নি প্রেমের অনুভব । গভীরতা হারায়নি ভালবাসার রহস্য । সেই কোন এক সুদূর অতীতে উত্তর ভারতে বর্ষাণা গ্রামের কিশোরী মেয়ে রাধার মন অনুরাগের রঙে রাঙিয়েছিল গোকুলের ছেলে শ্যামরায় । রাধা আর শ্যামের ভালবাসার আদতে কি পরিণতি হল তা কেউ বলতে পারে কি ? বৈষ্ণব পদকর্তা, বিদ্যাপতির রচনায় অমর হয়ে আছে তাদের বিরহ,

'ই ভরা বাদর
মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর ।'

অসংখ্য ভজনে, কীর্তনে, কবিতায়, কাহিনীতে, ছবিতে ধরা আছে তাদের প্রেমের বিভিন্ন রূপ । সে রূপে কখনও বা মিলনের বর্ণময়তা, কখনও বা বিষাদের প্রলেপ । কিন্তু সেই মিলন ও বিরহের খেলা অন্তহীন ।

'ছেলেবেলায় ভালবাসা ছিল
একটা জামরুল গাছের সঙ্গে ।
সেই থেকে যখনই কারো দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই
জামরুলের নিরপরাধ স্বচ্ছতা ভরাট হয়ে উঠেছে
গোলাপী আভার সর্বনাশে,
অকাতর ভালবেসে ফেলি তৎক্ষণাৎ
সে যদি পাহাড় হয়, পাহাড়
নদী হয়, নদী
কাকাতুয়া হলে কাকাতুয়া
নারী হলে নারী ।'

আমাদের পৃথিবীটা ভারী সুন্দর । ভারতীয় মহাকাশচারী রাকেশ শর্মাকে তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন করেছিলেন, 'মহাশূন্যে ভাসমান অবস্থায় কেমন দেখতে লাগে আমাদের এই বাসস্থানটিকে ?' উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা ।' তাই বারে বারে প্রেমে পড়তে ইচ্ছা করে এই পৃথিবী আর তার পাহাড়, নদী, সাগর, মরুভূমির সঙ্গে । প্রেম কি শুধু যুগলে ? প্রেম প্রকৃতির সঙ্গে, প্রেম জীবনের সঙ্গে, ভালমন্দ মিলিয়ে বেঁচে থাকার সঙ্গে । সূর্যমুখী সূর্যের দিকে চেয়েই আনন্দে দোলে । চাঁদের 'অলখ' টানে উদ্বেল হয় সাগরের জল । রুপোলী ধান খুঁটবে বলে ছটফট করে শালিক । এও প্রেম । এ আবেগের ব্যাখ্যা নেই । বিশ্লেষণ চলে না এ অনুভবের ।

ভালবাসা বহুমাত্রিক । আমাদের বাতায়নের মার্চ সংখ্যার বিষয় এই চার অক্ষরের শব্দটি — ভালবাসা । এই সংখ্যার বেশ কিছু কবিতা আর গল্পে আঁকা হয়েছে ভালবাসার নানা দিক । এ ছাড়াও আছে আমাদের অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ । এই সংখ্যার বিশেষ একটি রচনা হল কবি যতীন্দ্রনাথ সেনের স্মৃতিচারণ । গভীরভাবে একজন মানুষকে ভালবাসলে তবেই না তাঁর স্মৃতিকে বুকের মধ্যে লালন করা যায় ? শ্রদ্ধাও ভালবাসার আর একরকম আঙ্গিক । বাতায়নের জন্ম আর ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা-এ ও তো এক রকমের ভালবাসারই চরিতার্থতা । স্বপ্নকে ভালবাসা । এই সংখ্যায় আছে 'বইমেলার চিঠি' । কিছুদিন আগে কলকাতা বই মেলা শেষ হয়েছে । বইমেলার চিঠি অগুণতি পাঠকের বইপ্রেমের গল্প ।

ভালবাসাই হল সেই শক্তি যা হাজারো মারণাস্ত্রের থেকেও শক্তিশালী । ভালবাসাই মোকাবিলা করতে পারে আজকের পৃথিবীতে নেমে আসা অদ্ভুত এ আঁধারের ।

অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও আমাদের সংকলন সংখ্যা বের হচ্ছে জুলাই মাসে । আপানাদের ভালবাসা আর অকুণ্ঠ সহযোগিতায় আমরা এগিয়ে চলেছি । 'চিরসখা' খ্যাত ঔপন্যাসিক নবকুমার বসুর নতুন ধারাবাহিক 'হটাবাহার' বাতায়নে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করবে পুজোর পর থেকে । আমরা উত্তেজনায় অধীর । আপনারা সঙ্গে থাকুন আমাদের । ভাল থাকবেন । সুস্থ থাকবেন । আমাদের বাতায়ন সবসময় খোলা । একঝলক দখিনা হাওয়ার সঙ্গে নিজেদের ভাবনা চিন্তা পাঠিয়ে দিন এই অনুরোধ পাঠকদের কাছে । ভালবাসা ও শুভেচ্ছাসহ,

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়
২২ শে মার্চ, ২০১৮

Acknowledgement

Heartfelt thanks from Batayan Team to :

DEBAJYOTI CHATTERJI & SIKHA CHATTERJI
TRIBECA CARE
SUJOY GHOSH
BIJIT BISWAS

সূচীপত্র

Bangla Section

— কবিতা —

প্রেম চারমাত্রিক — 1
মানস ঘোষ

ভালোবাসার কবিতাগুচ্ছ — 2
আনন্দ সেন

বিষয় — 3
দ্বৈতা হাজরা গোস্বামী

যদিদং হৃদয়ং তব — 4
সুজয় দত্ত

ফেসবুক — 6
পিনাকী গুহ

উল — 6
ইন্দ্রাণী দত্ত

খুচরো — 7
ধীমান চক্রবর্তী

আধঘুম — 8
দেবাশীষ ব্যানার্জী

গভীর রাতের কবিতা — 9
সুদীপ নাথ

ভালবাসতে শেখো — 9
সুদীপ নাথ

বন্ধ জানলা — 10
শুভ্র দাস

কোথা সেই অগ্নিকন্যা — 11
শ্রীমন্ত মুখার্জী

অন্য জন্ম — 12
জয়িতা সেন

— গল্প —

ছোট গল্প — ফিরে দেখা — 13
স্বর্ভানু সন্যাল

প্রেম — 16
শাশ্বতী বসু

সম্মোহন — 22
অর্পিতা চ্যাটার্জী

বেবীসিটার জয়েস — 26
বানী ভট্টাচার্য্য

— অনুবাদ —

উপলব্ধি — 29
পুষ্পা সাক্সেনা (অনুবাদ সুজয় দত্ত)

— রম্যরচনা —

অবশেষে — 34
তহমিনা জাবিন মমি

বইমেলার চিঠি — 36
মানস ঘোষ

— স্মৃতিচারণ —

জীবনের কবি যতীন্দ্রনাথ — 39
শুক্লা সেন

জিষ্ণুর কবি যতীন — 40
জিষ্ণু সেন

— রন্ধনপ্রণালী —

বাঁধাকপি — কাহিনী 41
জয় মুখোপাধ্যায়

— ভ্রমন —

পুজোর ছুটিতে 43
মঞ্জিষ্ঠা রায়

English Section

Anzac Pride 50
Balarka Banerjee

A Choice Less Ordinary 51
Piyali Ganguli

ALL IN 54
Tinamaria Penn

Two Dragons Aflame 55
Allen McNair

For the Teachers 56
Jill Charles

This Sacred Land of Ours 57
David Nekimken

Temptation 58
Maureen Peifer

From Syria, with Love for Death 2016-18 61
Mita Choudhury

Of This, I Relate and I Can't Wait 62
Allen F. McNair©

Falling for the Magician 63
M. C. Rydel

Native American Flute History and Use 67
Patricia B. Smith PhD

P.S. Please don't generalise us ma'am/ sir! 69
Arka Ghosh

প্রেম চারমাত্রিক

মানস ঘোষ

প্রেম - ১
প্রেম, তোমার চোখের তেপান্তরে
পথ হারানো কিশোর কলমবাস ।
প্রেম, - তোমার কুসুম সমাগমে
মন খারাপের ভীষণ বদভ্যাস ।

প্রেম - ২
ফাগুনবেলায় আকাশ শামিয়ানা,
জুঁইয়ের সুবাস, বিসমিল্লার সুর
ফেনিল ঢেউয়ে যুগল অবগাহন ।
প্রেম যেন এক অনখ সমুদ্দুর !

প্রেম - ৩
বাতাসের মতো অনিবার্য ছিল
আর সকালের মতো প্রাত্যহিক ।
অমৃতের সুখ ঘর জুড়ে ছিল,
বাকি সবই ছিল . . . . বৈবাহিক ।

প্রেম - ৪
বাঁধানো দাঁতের কপট খুনসুটি
প্রেম তোমার চশমা খোঁজার ছলে ।
সেতার-সরোদ যুগলবন্দি যেন
বলিরেখাও কত যে সুর তোলে ।

মানস ঘোষ । মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা করার পর, বেছে নেন, সমস্ত আবেগ, ভাবালুতা আর ব্যক্তিগত পরিসরকে তছনছ করে দেওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ এক পেশা, ভারতীয় রেলের ''ট্রেনচালক'' । এই গ্রহে উনিই প্রথম ট্রেনচালক যার একটি বাংলা কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে । জীবিকা যাপন ও প্যাশনের এই পাহাড়প্রমাণ বৈপরীত্যের যন্ত্রণা কখনো তাঁকে স্তব্ধ করেছে, কখনো আবার আলোকিত বর্ণমালা নিয়ে হাজির হয়েছেন খোলা 'বাতায়ন' পাশে, আমাদের মাঝে ।

কবিতা

ভালোবাসার কবিতাগুচ্ছ

আনন্দ সেন

১ ।।
কথারা গড়িয়ে কলমের ঠোঁটে ঠোঁট রেখেছিল বলেই
আকাশে মেঘেরা আড়ি পেতেছিল, বৃষ্টিও তাই চলেই
যাবে ভেবে শেষে থমকে দাঁড়াল খোলা জানালার পাশে
একটা কি দুটো প্রেমের গল্প যদি বা ভিজতে আসে ।

২ ।।
খাতা খুলে করছি হিসেব
একের পরে দুই
বৃষ্টি এসে বলল ডেকে
আয় তোর বুকের মাঝে শুই

বুকের ভিতর আগুন ছিল
উঠল ফুঁসে ইস্
এইখানেতে আমি থাকি
তুই অন্য কারো নিস্

হিসেব কখন চুলোয় গ্যাছে
মনটা পুড়ে খাক্
কিন্তু শরীর বৃষ্টিধারায়
একসা ভিজে কাক ।

৩ ।।
সারাটা দিন রাখব আলোয় ঘিরে
আমাকে তুই রোদ বলেই ডাক্
ভিজিয়ে হৃদয় সারা শরীর জুড়ে
তুই আমার বৃষ্টি হয়েই থাক্ ।

৪ ।।
সকালবেলায় বা মাঝরাতে
শুরুতেও তো তুমিই ছিলে
পরতে পরতে জড়াতে জড়াতে
এখন রয়েছো অন্ত্যমিলে ।

৫ ।।
জাগ্ রে মেয়ে জাগ্, বাইরেতে পা রাখ্
বুক ভরে নে শ্বাস
ভোরের আলো যেমন; পাতার ঘটায় মরণ
তেমনি ভালবাস্

৬ ।।
মেঘে মেঘ ছুঁয়ে ঝলকাতে পারি
পারি সে অশনি হতে স্ফুলিঙ্গ কুড়িয়ে
তার নাম লিখে দিতে আকাশের গায়ে
যার কাছে একদিন হাত পেতেছিল আশাবরী ।

Ananda Sen is a Professor of Biostatistics at University of Michigan. Ananda also passionately pursues the hobby of acting whenever he can. When feeling stressed, he takes recourse to the Abrho keyboard on his desktop and types up Bengali poems. He is a regular contributor to Batayan. Ananda lives in Ann Arbor, Michigan with his wife and two kids.

বিষয়

দ্বৈতা হাজরা গোস্বামী

শীতের বিষয় অঙ্ক না জ্যামিতি
রোদের বিষয় এক্কা দোক্কা খেলা
হাওয়ার বিষয় হারিয়ে যাওয়া চিঠি
ঘুড়ির বিষয় একলা দুপুরবেলা

নদীর বিষয় ভাসিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে
জলের বিষয় চোখের গভীর কালো
হাতের বিষয় হাত এগিয়ে দিচ্ছে
বাসার বিষয় শুধুই নাকি ভালো

ঠোঁটের বিষয় শব্দ থেকে গাঢ়
দাঁতের বিষয় মনে রাখার দাগ
নখের বিষয় পদ্মপাতায় লেখা
আঁচড় কেটে গোপন অনুরাগ

সেলের বিষয় আসলে মধ্যবিত্ত
সস্তায় পাওয়া ফুলছাপ শাড়ি চাদর
সুখের বিষয় তোমার জন্য নিত্য
এস এম এস করা দু এক লাইন আদর

ডঃ দ্বৈতা হাজরা গোস্বামী বর্তমানে ব্যাঙ্গালোরে থাকেন। জন্ম – মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জে। কলকাতার লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত সাহিত্য এবং বৈদিক সাহিত্যে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর। কলেজে প্রিন্সিপাল'স মেডেল পেয়েছেন অলরাউন্ড পারফরমেন্স এর জন্য। ব্যাঙ্গালোরের জৈন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি করেছেন। রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশমূলক নীতি এবং বৈদিক সাহিত্যে পরিবেশ বিষয়ক নীতি ছিল গবেষণার বিষয়। জৈন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। সম্পাদনা করেন বাংলা কিশোর ওয়েব ম্যাগ ম্যাজিক ল্যাম্প। ছোটবেলা থেকেই লেখালেখির শুরু। লিখতে ভালোবাসেন কবিতা ও ছোটগল্প। ছোটদের জন্য প্রথম গল্প সংকলন ''সাত আকাশের ওপারে'' (নান্দীমুখ প্রকাশন ২০০৫) প্রকাশিত হয় কলেজ পড়ার সময়। কবিতার সংকলন – কবিতার পঞ্চপ্রদীপ (দ্বীপ প্রকাশন ২০১৫), মেঘ বৃষ্টি কথা (ধানসিঁড়ি প্রকাশন ২০১৮), থ্রি, একটি থ্রিলার সংকলন (ফ্যাভ বুকজ পাবলিকেশন ২০১৮)। এছাড়াও কিশোর ভারতী, শুকতারা, আনন্দমেলা, প্রভৃতি পত্রপত্রিকা এবং বিভিন্ন ওয়েবম্যাগে গল্প, কবিতা লিখে থাকেন। এই প্রথম প্রাপ্তমনস্ক থ্রিলার লিখছেন। লেখালেখির বাইরে কবিতা পাঠ, গল্প পাঠ করতে, ছবি আঁকতে, ও বই পড়তে ভালোবাসেন।

কবিতা

যদিদং হৃদয়ং তব

সুজয় দত্ত

ছাদ্‌নাতলায় দাঁড়িয়ে আছে লম্বা, সুঠাম ।
সামনে কে ঐ লাল চেলিতে পিঁড়ির ওপর ?
পানের পাতায় মুখটি ঢাকা, সোনার বরণ —
দেখছে তাকে গরদ-ধুতি, মাথায় টোপর ।

দেখছে, তবু ভাসছে মনে অন্য ছবি ।
একটা স্মৃতির টুকরো কেবল আসছে ফিরে ।
সেই কবে কোন্ বর্ষাদিনের মেঘলা সকাল —
এক কলেজের ক্যান্টিনেতে দারুণ ভীড়ে

''এই যে দিদি, একটা কফি আর দুটো চা —
খুচরোতে দিন, কুড়ি টাকার নেই ভাঙানো ।
এক বা পাঁচের নোট বা কয়েন দিইনা ফেরত —
দেখেননি কি, বাইরে আছে বোর্ড টাঙানো ?''

''এই সেরেছে, খুচরো তো নেই, অ্যাই রূপালি —
দেখ্ না ব্যাগে, থাকলে দে না দামটা দিয়ে ।''
''দুত্তেরি ছাই, দেখব কী আর, পার্স আনিনি
ভাল্‌লাগে না রোজ ঝামেলা খুচরো নিয়ে !''

''দাঁড়াও দাঁড়াও, এই যে ধরো, আমার আছে''
পিছন থেকে কে যেন দেয় হাত বাড়িয়ে
''আরে না না'', ''ডোন্ট হেজিটেট্'', ''থ্যাংকু সো মাচ্''
''চলো কোথাও একটু বসি বাইরে গিয়ে ।''

''আমি ঝিলম্, ও রূপালি, হিস্ট্রি অনার্স''
''আমি সরিৎ, ইলেক্ট্রিকাল, থার্ড ইয়ারে''
সেদিন ছিল একটু দ্বিধা, আড়ষ্টতা ।
মাস না যেতেই ছুটল গাড়ী টপ্ গিয়ারে ।

''এই যে ম্যাডাম্, সময় হল এতক্ষণে !
এইখানে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি ঘন্টাখানেক''
''ওমা সেকি ! দেখিস্‌নি তুই মোবাইলে ?
তখন থেকে টেক্সট্ করেছি প্রায় শ'খানেক ।

বাইপাসেতে আটকে ছিলাম বিশ্রী জ্যামে ।
যাক্‌গে, এখন চলছে ট্রেলার, সময় আছে ।''
হল্ তো আঁধার, দেখছে না কেউ, তাই বাধা নেই
উষ্ণ নিবিড় আলিঙ্গনে টানতে কাছে ।

ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি এক সকালে
গোলাপ তোড়া, হার্ট্ চকোলেট কে পাঠালো ?
''এই যে মশাই — খুব পাকামি ! ভ্যালেন্টাইন্ !
পারবি এমন সারাজীবন বাসতে ভাল ?''

এই প্রশ্নের জবাব পাওয়ার প্রথম সুযোগ
এল যেদিন লুকিয়ে রাতের অন্ধকারে —
শরীর যেন সমুদ্র আর চোখ ডুবুরি —
খুঁজলো মাণিক হোস্টেলের এক বন্ধ ঘরে ।

''কী হল ঝিল্, হঠাৎ দুদিন নো যোগাযোগ ?''
''কারণ আছে''। ''বল্ না, বাবা'' ''কী লাভ শুনে?''
''বলতে তোকে হবেই'' । ''কেন, তুই বলেছিস্ —
নয়ডা তে তোর চাকরি নতুন পয়লা জুনে ?

সেটাও আমায় শুনতে হলো শ্রীজার কাছে !''
''কী যে বলিস্ ! তোকেই প্রথম বলব বলে
বাড়ীতে কাল মা-বাবাকেও গেলাম চেপে ।
শ্রীজার তো সোর্স্ নয়ডাতে ওর কাকার ছেলে ।''

স্পাইস্ জেটের দিল্লী উড়ান 'স্টার্টিং টু বোর্ড' ।
এনক্লোজারের ওধারে দুই বিষণ্ন চোখ ।
আছে যুগল স্বপ্ন, আছে প্রতিশ্রুতি —
তবু কেন আশংকা-মেঘ ঢাকছে পুলক ?

''এসো এসো সরিৎ । আবার প্রণাম কেন ?
অনেক তোমার নাম শুনেছি শ্রীজার কাছে ।
ডাকছি ওকে । তোমরা দুজন গল্প করো —
শ্রীজার কাকী রান্নাঘরে ব্যস্ত আছে ।''

''তারপর, বল্ চলছে কেমন ? নতুন অফিস্ —
বস্ কি কড়া ? রাতে কটায় ফিরিস ঘরে ?
আমি এখন আছি কদিন কাকার কাছে —
লাগলে একা, চলে আসিস সান্ডে করে ।''

ঝিলম এখন কলকাতাতেই, ব্যস্ত ভীষণ ।
থার্ড ইয়ারের পরীক্ষা আর দাদার বিয়ে ।
নয়ডাতে তো নেই চেনা কেউ, এক ঐ শ্রীজা —
কাকার বাড়ীর কাছেই ভাড়ার ফ্ল্যাটটি পেয়ে

মন খুশী হয় । সন্ধ্যেবেলায় আড্ডা মারার,
হপ্তা-শেষে শপিং মল্ আর রেস্তোরাঁতে
ঘুরতে যাবার সঙ্গী এখন হাতের কাছেই ।
ফান্ অ্যান্ড্ ফ্রলিক্ — শ্রীজার তো নেই ক্লান্তি তাতে ।

এক কলেজে, একই ক্লাসে পড়েও শুধু
ছিল আলাপ, ছিলনা ঠিক ঘনিষ্ঠতা ।
কাছ থেকে তাই দেখার সুযোগ হয়নি আগে —
সুন্দরী বেশ, চালচলনে খরস্রোতা ।

''আরে, একী ! কী করেছিস ? এসব কেন ?''
''আজকে যে তোর বার্থ্ডে, নিজেই গেছিস ভুলে ?''
ডান হাতে কেক, বাঁ হাতে গিফ্ট্, দাঁড়িয়ে শ্রীজা —
অবাক সরিৎ দেখলো ফ্ল্যাটের দরজা খুলে ।

বার্থ্ডে উইশ ফোনেও এল একটু পরেই ।
সরিৎ তখন বাথ্রুমেতে, পোশাক পরে
হচ্ছে রেডি, দুজনে আজ ঠিক করেছে
সারাটা দিন ঘুরবে শহর মেট্রো চড়ে ।

হাতের কাছেই বাজছিল ফোন, তুলল শ্রীজা ।
ওপার থেকে প্রশ্ন অবাক, ''সরিৎ আছে ?''
''হু ইজ্ কলিং ?'' ''আমি ঝিলম''। ''ও, এটা তুই!
সরিৎ বিজি । ফোন্টা এখন আমার কাছে ।''

''ঠিক আছে, থাক''। ফোন কেটে যায় । উঠল কী ঝড়?
হঠাৎ করে কালো মেঘের আনাগোনা
মন-আকাশে ? রঙীন আশার প্রজাপতি
হারিয়ে গেল ? স্বপ্ন-পাখীর ভাঙল ডানা ?

''জন্মদিনের শুভেচ্ছা নিস । ভাল থাকিস ।
তুই যা যা চাস, সব পেয়েছিস আশা করি'' —
ছিল নীরব টেক্স্ট্ মেসেজ্ এক, হয়নি খেয়াল ।
জবাব দিতে করল সরিৎ অনেক দেরী ।

বিচ্ছিরি এক রোগ পেয়েছে তরুণ সমাজ ।
রোজ শহরের ব্যস্ত পথে গাড়ীর ভীড়ে
স্মার্ট্ ফোনে হয় চ্যাট্ এস্-এম্-এস্ অন্যমনে ।
আসছে ধেয়ে বাস-লরি-ট্রাম — চায় না ফিরে ।

সকাল-বিকেল এমনতরো দুর্ঘটনা
রোজই ঘটে, হয়না টিভির নিউজ স্পেশ্যাল ।
নিজের মরণ নিজেই ডেকে আনছে যারা,
সেই তালিকায় যোগ হল আজ ঝিলম ঘোষাল ।

কথায় বলে দুঃসংবাদ হাওয়ায় ওড়ে ।
নয়ডাতে তার পৌঁছে যেতে হয়নি দেরী ।
প্রাপক তখন কনট্ প্লেসের ঠান্ডা হল্-এ
শ্রীজার পাশে দেখছে বসে 'হেরাফেরি' ।

দুদিন ধরে চোখের পাতা এক করেনি ।
পরশু উড়ান, চলল ফিরে কলকাতাতে ।
যার কাছে হায় যাবার ছিল অনেক আগেই —
ছবিটি তার ঢাকা এখন ফুলমালাতে ।

দিন চলে যায়, স্মৃতির ক্ষত শুকিয়ে আসে ।
স্বপ্ন ভাঙে, স্বপ্ন গড়ে নতুন ছাঁচে ।
ঝিলম নদীর জল ছিল সে, কিন্তু এখন
শ্রীজার সাথেই জীবনটা তার জড়িয়ে আছে ।

বছর যেতেই জড়িয়ে নিল সাত পাকেতে ।
বিদায় অতীত — আগামী হোক পরম সুখী ।
রাতের শিশির গোপন থাকুক অন্ধকারে ।
সূর্যকিরণ আঁকড়ে থাকুক সূর্যমুখী ।

কবিতা

ফেসবুক

পিনাকী গুহ

আত্মপ্রকাশে অনেক সুখ
সেজন্য ই ফেসবুক

তোমার জীবন ব্যক্তিগত
অনর্গল অবিরত

হারানো প্রেমের পদাবলী
ফেসবুকের অলিগলি ।

হৃদমাঝারে রক্ত ঝরে,
মেগাবাইটের অভিসারে ।

কখনো দেখি সংগোপনে,
সিঁদুরে মেঘ ছাপোষা মনে ।

না-বলা কথায় ছোট্ট লাইক,
এই টুকুই আন্তরিক ।

গৃহপালিত শাহরুক খান,
শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ।

আসলে আমি সংসারী নই,
কবিতা লিখি সেজন্যেই ।

উল

ইন্দ্রাণী দত্ত

বেড়াল ছানারা খেলা করে
ক্রমাগত
স্বপ্নের ভেতরে
রামধনু রঙের মত তিনটে বেড়াল
ওঠে নামে খেলা করে
কয়লার গাদায়
কাছে এলে দেখা যায়
আলো নয় রং নয়
উলের সূতোয়
জড়ানো রয়েছে সব
বেড়ালের ছানা ।
লাটাই খুঁজতে গিয়ে
উল্টো সোজা হাতে বোনা
ছেঁড়া খোঁড়া উলের ব্লাউজ

গোঁজা দেখি কয়লার গাদায় ।

পিনাকী গুহ – জন্ম দক্ষিনেশ্বর । বেড়ে ওঠা চন্দননগরে । কর্মসূত্রে চেন্নাই, কলকাতা, মুম্বাই থেকে পাড়ি মার্কিন মুলুকে । অধুনা বৃহত্তর শিকাগোর বাসিন্দা । স্ত্রী পৌলমী ও একমাত্র পুত্র প্রমিতকে নিয়ে চলে সংসারের আঁকিবুকি । এরই মাঝে নেশা আড্ডা, অসময়ে ঘুম আর লেখালিখি ।

ইন্দ্রাণী দত্ত – সিডনির বাসিন্দা পেশায় বিজ্ঞানী কিন্তু গল্প লেখার তীব্র আকুতি টের পান । শঙ্খ ঘোষ বলেছিলেন, ‘‘আমরা যখন সত্যিকারের সংযোগ চাই, আমরা যখন কথা বলি, আমরা ঠিক এমনই কিছু শব্দ খুঁজে নিতে চাই, এমনই কিছু কথা, যা অন্ধের স্পর্শের মতো একেবারে বুকের ভিতরে গিয়ে পৌঁছয় । পারি না হয়তো, কিন্তু খুঁজতে তবু হয়, সবসময়েই খুঁজে যেতে হয় শব্দের সেই অভ্যন্তরীণ স্পর্শ ।’’ ইন্দ্রাণী খুঁজে চলেছেন ।

খুচরো

ধীমান চক্রবর্তী

*

সাত সকালে তার কপালে বিপথগামী এক গুছি চুল
আমার দু'চোখ আর কি খোঁজে এর চে' বেশি অন্য কিছু ?

*

তুই হাসলেই মুক্তো -
আমি দূর থেকে দেখতাম

*

তুই আকাশে চোখ তুললি -
আমি কেমন ক'রে ভুলব ?

*

তিস্তায় চাঁদ হয়েছে স্বয়ম্বরা -
মন ভেসে যায় একা ছোট সাম্পানে ।

*

বলেছিলে, ''ভালো থেকো ।''
তাই ভালো থাকি প্রতিদিন ।

*

অথচ বিদায়কালে বলার কথা তো কিছু খসড়া করিনি
কেন না তোমায় আমি ভালোবেসে শুধু হাতে হাত ছুঁয়ে যাব ।

ধীমান চক্রবর্তী — জন্ম : ১৯৬৬ কলকাতা । বাল্য দিল্লিতে, কৈশোর কলকাতায়, প্রথম যৌবনের অধিকাংশ মুম্বাই-তে অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে প্রবাসী — প্রধানত এবং বর্তমানে মার্কিন মুলুকে, কিছুটা সময় জার্মানি এবং ফ্রান্স-এও । পেশায় পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ও গবেষক । কাজের বাইরে সর্বঘটে কাঠালি কলা । নেশা : চা, ঘুম, কলকাতা ।

কবিতা

আধঘুম

দেবাশীষ ব্যানার্জী

এখনো চোখে আধঘুম
এখনো আঙুলে মাটির মিহি চাদর
সন্ধ্যা আরতি জেগে আছে সূর্যের মতো
আয়ুরেখার পথ ধরে তার আঁচ
এখনো জীবিত
আলগা এ উষ্ণতার আবেশ রেখে
তবু নিঃসঙ্গ, তোমার আদর

এখনো দুপুরবেলা
দূরদেশে লুকোচুরি খেলা
পেরোতে পারেনি দিন
কয়েক পা উঠোনের পথ
ছুঁয়ে দিল আনমোনে
আগমনী ভোরবেলা

এখনো অকপটে
এক পাগলাটে ফড়িঙের দল
কাশবনে দোলে, অবিকল
গিঁট বাঁধা সময়ের ডাকে
ধরা দিল আঙুলের ফাঁকে
মুহূর্তেরা উদাসীন, নিশ্চল

এখনো সেদিন
সর্ষেবনে খেলতে গিয়ে, দলছুট
এ আল ও আল দিয়ে নিজের সাথে ছুঁয়োছুয়ি
পড়ন্ত বিকেলে, ধানের শীষেরা
আঁকছে ছবি নির্ভেজাল আকাশে
তোমারই মুখের আদল, নিখুঁত
জানিনা কখন জড়িয়েছে শীত
জানিনা কখন টুপ্ টুপ্ করে
ঝরেছে কয়েকফোঁটা হিম

জানি ভাঙিয়েছ ভাতঘুম, তুমিই সেদিন
আজ বুঝি দশমী
তাই আজ একা, তুমি আর আমি
রং চটা পশ্চিমের ঘরের দেয়াল জুড়ে
তোমার রঙিন দিনগুলো সাদা কালোয় বন্দি
যত রং আজ ওই ঠাকুর দালানের উঠোনে
হাড়িকাঠের গা বেয়ে উঠছে কপালে
কখনো বা সিঁথি থেকে সিঁথিতে, শাঁখাতে
মৃত্যুর নিষ্ঠুর পরিণতি সাথে জীবনের উচ্ছাস
যেন মিলে মিশে এখন তরল, স্বাভাবিক পানীয়
সবাইকে করেছে মাতাল, আদিম নির্মম এক উৎসবে
তোমার আর আমার নাকি লাল রঙে ভয়
তাই বুঝি এতো বন্ধুত্ব সয়,
নারকেল নাড়ু, গুড় মুড়কি দিয়ে
তাই বুঝি সন্ধি
এখনো, যেদিন ক্যানভাস ফাঁকা
তোমার বসন যেমন ফ্যাকাশে, সাদা
এখনো, যখন রাতে ডাকে নিশি
লাল রং ভয় চায়, আর একটু
আরও একটু বেশি
আসে পাশে পাই তোমায়, শ্যামাপিসি

আজ আকাশটা নরম
বৃষ্টি হয়ে ঝরে গেছো সেই কবে
একের পর এক সূর্য এসে শুকিয়ে দিয়েছে মাটি

তবু এখনো ভোরবেলা
আমি খালি পায়ে হাঁটি
যদি ছুঁই দু-একটা শিশির কণা
আসে একটু আধঘুম
আসে সুখ দানা দানা

দেবাশীষ পেশায় পদার্থবিদ্যার গবেষক, তবে যতটুকু সময়ের ফাঁকফোকর তাতে শুধু কবিতা নিয়ে ভাবনা চিন্তা আর সাহিত্যের ছাত্র হবার বাসনা। দেবাশীষের লেখা কিছু লিটল-ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে। দেবাশীষ সপরিবারে মিশিগানের বাসিন্দা।

কবিতা

গভীর রাতের কবিতা

সুদীপ নাথ

গভীর রাতের কবিতা
সকালে ঝাঁট দিয়ে ফেলে দেয় ।
কবি চলে যায় ভোরের শব্দ কুড়োতে ।
সেকি আর কপাল ছুঁয়ে সারাদিন বসে থাকে
তার রুগ্‌ণ কবিতার পাশে ?
কবিতা দোর খুলে টাল মাটাল বেরিয়ে যায় ।
এখানে সেখানে ঘুরে আসে
এর বাড়ি, তার বাড়ি কড়া নাড়ে
মাঝে মাঝে দুর্মূল্য ভাললাগা ভিক্ষে নিয়ে
বিকেলে ঘরে ফিরে আসে ।

ভালবাসতে শেখো

সুদীপ নাথ

আমি যখন তাকিয়ে থাকি তোমার দিকে
পাল্টায় না কোথাও একটা পরমাণু ।
সুযোগ পেয়ে পৃথিবীটাও দাঁড়িয়ে থাকে ।
বৃদ্ধ সময়টাও বোঝা রেখে নতজানু ।

আমি যখন বসেই থাকি তোমার পাশে
কথার ভিড়ে হারিয়ে যায় সে নীরবতা ।
ছবি আঁকতে ব্যস্ত থাকে ভোর আকাশে
সূয্যি ভোলে হঠাৎ উঁকি দেওয়ার কথা ।

আমি যখন একলা, পাশে তোমার ছায়া
পৃথিবীটাও লাগাম ছাড়া ছুটছে তখন ।
পাল্টে যাচ্ছে সব কণিকা, সে এক মায়া
তুমি ফিরে এসেই আমার চোখে তাকিয়ে দেখো ।

সময়ের সাথে যুদ্ধ করে ভালবাসাতে শেখো . . . .

পেশায় সফট্‌ওয়ার ইঞ্জিনীয়ার, নেশায় লেখক । কলেজে কবিতা লেখার দিন ছেড়ে আসার পর পাঁচ বছর আগে হঠাৎ করে লেখনী আবার চলতে শুরু করেছে । যেন এত দিন মনে মনে লেখা হত, আজকাল শব্দগুলো কীবোর্ডের ছোঁয়া পাচ্ছে । কবিতার বই 'নির্বাসিত কবিতা' প্রকাশিত হয়েছে । কবিতা আর গল্প — দুটোই লিখি । সময় পেলে জলরঙে ছবিও আঁকি । সময় না পাওয়ার ব্যস্ততা এবং আলসেমীর পাহাড় পেরিয়ে নতুন কিছু লেখার চেষ্টা করে যাচ্ছি ।

কবিতা

বন্ধ জানলা

শুভ্র দাস

কলকাতায় এবার দেখি পাতাল রেলের কাজ চলছে পুরো দমে,
মোড়ে মোড়ে ভুল বানানের ফেস্টুনে হাসিমুখে মমতা,
কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, নতুন নতুন শ্রীতে ফেটে পড়ছে শহর, অথচ
জানলারা সব বন্ধ ।

মহাত্মা গান্ধী থেকে সদানন্দ রোড, পাঁচ মাথার মোড় থেকে দমদম পার্ক,
ছোট বাড়ি, বড় বাড়ি, রং চটা বাড়ি, পাট ভাঙা নতুন বাড়ি;
এমনকি পাস দিয়ে ফ্লাইওভার চলে যাওয়া উঁচুতলা বাড়িগুলোও,
জানলারা সব বন্ধ ।

নোংরা রাস্তাতে ধূলো বালি, তবুও
রোল-চাওমিনের দোকানে ভিড়ের কমতি নেই,
দাঁড়ানোর জায়গা হচ্ছে না কেএফসিতে, হলদিরামে মাছি গলবে না অথচ
জানলারা সব বন্ধ ।

মিত্র থেকে হিন্দু স্কুল পর্যন্ত পড়ুয়াদের লাইন পড়েছে,
জ্ঞানের পাহাড় চড়ছে সবাই; বাইরে যাবার ইচ্ছায়
মন চঞ্চল হবার সময় নেই মোটেই; তাই হয়তো,
জানলারা সব বন্ধ ।

বনেদি বাড়িরা ভেঙে, ভেঙে, রাগে, দুঃখে আটখানা হয়েছে,
আদায়-কাঁচকলায় মাখা মাখি শরিকের দল,
ভাইয়েরা নিজেদের বেজার মুখ দেখতে দেখতে পচিয়ে ফেলেছে চোখ, তাই
জানলারা সব বন্ধ ।

অলস দুপুরে, জলের নুপূরে, আকাশের দিকে চেয়ে
কুলফিওয়ালার ডাক শুনত যারা,
তারা এখন অফিস থেকে রিটায়ার করে টিভির সামনে ফুল-টাইম, তাই
জানলারা সব বন্ধ ।

কেবল নাটকের স্টেজে টিমটিম করছে জানলার ধারের অমল,
আজকের অমল থাকে স্মার্টফোনের জানলায়,
মনের জানলা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেছেন সিধু জেঠু,
বাকি জানলারা তাই আজ সব . . . . .

শুভ্র দাস গত তেইশ বছর ডেট্রয়ট, মিশিগান নিবাসী । পেশায় মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারং-এর প্রফেসর । জন্ম ও ছোটবেলা কেটেছে হাওড়ায় । পড়াশোনা খড়গপুর আই. আই. টি ও আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে । নেশার মধ্যে ছবি তোলা ও ছবি আঁকা, লেখা লেখি, ঘুরে বেড়ানো, নাটক ও পলিটিক্স । বর্তমানে রেসিস্টেন্স মুভমেন্টে অনেক সময় কাটছে ।

কবিতা

কোথা সেই অগ্নিকন্যা

শ্রীমন্ত মুখার্জী

যার –
অগ্নিবীণার ঝংকার
অগ্নিবীণার টংকার
ঘুচাইবে সকল
অমঙ্গল আশঙ্কার !

সেথা –
''যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালু রাশি
বিচারের চেতনাকে ফেলিয়াছে গ্রাসী''
শাঁখের আওয়াজ উলুধ্বনি
সানাই বাজিছে বেহাগে
মায়ের কোলের ছোট খুকু আজ
সেজেছে বধূর নবরাগে !

বধূকে ঘিরিয়া বন্ধু স্বজন
পাড়া প্রতিবেশী আরো কতো জন
চারিদিকে শুধু মাথা আর মাথা
বধূ মাতা হলো উধাও যে কোথা

পানে মুখ ঢেকে কম্পিত হাতে
দাদা ভাই মামা বাহিত পিঁড়িতে
এলো বধূ সখী দুহাত বাড়িয়ে
মাতারাণী শুধু আড়ালে দাঁড়িয়ে

আপ্যায়নের অজুহাত দিয়ে
মাতা রয় দূরে এ কেমন বিয়ে ?
জীবন যুদ্ধে স্বামী হারা নারী
তাই সমাজের ফরমান জারি !
নিজ কন্যার শুভ পরিণয়ে
মাতা সরে থাকে সমাজের ভয়ে !

নাই বা থাকলো রাম, রবি আজ
ঈশ্বর, নজরুল
তাদের দেখানো পথ পড়ে আছে
করোনা যেন গো ভুল !

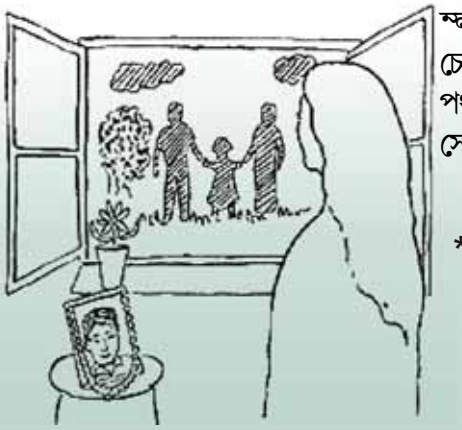

গাহি সাম্যের গান
সমস্ত নারী সমান –
মায়ে মেয়ে ভরা বাংলার ঘর
ঘুচে ভেদাভেদ আপনি কি পর
বধূবরণের মঙ্গলক্ষণে
নবজীবনের উষার লগনে
মায়ের ছোঁয়ায় মেয়ের অমঙ্গল ?

রসাতলে যাক সেই স্ত্রী আচার
ভুলের সাগরে খুঁজোনা বিচার
''এয়ো নারী'' আর ''ভুয়ো নারী'' বলে
যারা রব তোলে কাঁপিয়ে আকাশ
মঙ্গলময় মায়ের ছোঁয়ায়
নতুন চিন্তা পাক অবকাশ !

ম্লান হাসি মাগো অনেক সয়েছি
চোখের জলের বন্যা
পথ চেয়ে রবো কবে দেখা দেবে
সেই নতুন অগ্নিকন্যা ।

****

আমার প্রথম ''ছবিতা''
জ্বলুক ''বাতায়নে''।

আগুনের পরশমনি
ছুঁয়ে যাক
বরণডালার প্রদীপ খানি ।

মায়ের পরশে
প্রায়শ্চিত্ত হোক
শেষ হোক
অমানবিক যুক্তিহীন
কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচারের ।

শ্রীমন্ত মুখার্জী সিডনি বাসী, আনন্দধারার (The Stream of Joy) কর্ণধার । সাহিত্য প্রধান নেশা । আনন্দধারা গত কুড়ি বছর ধরে বয়ে চলেছে এবং মানুষের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে তাদের মনের খোরাক – ভাল বই ।

কবিতা

অন্য জন্ম

জয়িতা সেন

দূরভাষে হঠাৎ কথা
''হ্যালো ! কেমন আছিস ?
''আরে কত দিন পর, কোথায় থাকিস ?''
''তা তেইশ বছর কম না ।''
কর্মমুখর দ্বিপ্রহরে
বন্ধুর দীর্ঘচেনা গলার স্বরে
এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা ।

আমার
এক আকাশ হারিয়ে যাওয়া ছোটবেলা
এক মাঠ গোধূলি রঙা কৃষ্ণচূড়া
সবকিছু দুই হাতে মেখে
মন খারাপের নুড়ি বেছানো
স্মৃতির আল বেয়ে
সাবধানে এক পা দু পা ফেলে
এক জন্ম থেকে অন্য জন্মে হেঁটে

যাওয়া ।
পরদিন
দূরভাষে আবার ''হ্যালো''
এবার আর সাবধানি পায়ে নয়
পুরনো অতীত চকিতে চোখের সামনে ।
ভীমপলশ্রী রাগে মাখানো
গোধূলি বেলা
আর দিগন্ত রেখায়
আমার এক সকাল মা
এক রাত্রি বাবা
লম্বা ঝুলের ফ্রক
কুমীর তোমার জল কে নেমেছি ।

বাবা হাসছে, মা হাসছে,
আমার ছোটবেলা বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছে
সারা আকাশ এখন আমার গোধূলি
মন খারাপের টুকরো ছবির লুকোচুরি
হলুদ পাখির ঠোঁটে পাওয়া জীয়নকাঠি
বাবা মায়ের পরশ মাখা স্নেহের দিঠি ।

দূরভাষে ই ছোট্ট একটা হ্যালো
তার ওপরে ই থমকে থাকা
ছোটবেলার আলো ।
আমার মেয়েবেলার আলো ।

অধুনা মিশিগান নিবাসী, আগে IOWA, নেশা বই পড়া আর ললিত কলা চর্চা । বর্তমানে XPO Logistics Pricing Department-এ কাজ করেন ।

ছোট গল্প – ফিরে দেখা

স্বর্ভানু সন্যাল

বিপাশা নদীর তীরে ইতস্তত ছড়ানো উপল খন্ড । হাওয়ায় একটা ঠান্ডা আমেজ । সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছে । দিনের এই সময়টার নদীর ধারটার লোকজন কম । দুদিন হল বেড়াতে এসেছে সৃজন আর শিঞ্জিনী । ওদের বিয়ের পরে প্রথম বেড়াতে আসা । মধুচন্দ্রিমা । শিঞ্জিনীর নরম আঙ্গুল গুলো আলতো করে ছুঁয়ে সৃজন আনমনা হয়ে দেখেছিল । দূর পাহাড়ের কোলে, কোন এক কল্পশয্যার লোভে, ক্লান্ত সূর্যটার ঢলে পড়াটা মুগ্ধ চাতক পাখির মতই দেখছিল সৃজন । কোনোদিন দেখে নি ও এ দৃশ্য । কোনোদিনোও । পৃথিবীটা, এই সন্ধেটা পারফিউমের হালকা মিষ্টি গন্ধে শিঞ্জিনীর গায়ের আশেপাশে জড়ো হয়ে থাকা আদুরে বাতাস আজ ওর কাছে ভোরের নরম ঘাসে শিউলি ফুলের আদরের মতই সুন্দর মনে হয়েছে । ঝুপ করে ওই দূরে পাহাড়ের নিচে হারিয়ে গেলো উজ্জ্বল কমলা রঙের গোল চাকতিটা । সেই প্রায় অন্ধকারে সুদীর্ঘ দেবদারু গাছগুলো আদিম দেবতাদের মতই মৌন, মগ্ন হয়ে যেন কোন এক অরুপ বিমূর্ত আনন্দময়ের ধ্যানে স্থির, অচঞ্চল হল । আধো-আলো, আধো ছায়া আলেয়ার মত এক অবোধ্য নির্জনতায় এখন শিঞ্জিনীর দিকে তাকিয়ে সৃজন । জ্যোৎস্না প্লাবিত অরণ্য ভূমিতে রিরংসু হরিণের মতই মুগ্ধতা সে দৃষ্টিতে ।

‘‘কি দেখছ ? প্রথম বার দেখছ নাকি ?’’ এইমাত্র ডুবে যাওয়া গোল চাকতিটার উজ্জ্বল কমলা রঙ এখন যেন শিঞ্জিনীর গালে । আঙ্গুল খানা ছড়িয়ে নেওয়ার একটা অনিচ্ছুক প্রয়াস করে সে ।

‘‘নতুনই তো দেখছি । শুধু তোমাকে কি নতুন দেখছি, আজ তো আমি সব কিছু, এই সূর্য, এই আকাশ, এই দেবদারু গাছ, এই বিপাশার ঘুর্ণাবর্ত সব কিছু নতুন দেখছি । নতুন করে দেখছি ।’’ অর্থপূর্ণ হাসি হেসে কথাটা বলে সৃজন । আর তারপর হাতে ধরা হাতটায় হালকা চাপ দিয়ে সৃজন কাব্য করে বলে ‘‘আর তুমি, আমার মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন, তোমার কি এত তাড়াতাড়ি এত কিছু দেখার জিনিস, দৃশ্যমান সব বস্তু আর প্রাণী, আর সর্বোপরি আমি, সবই কি এতো তাড়াতাড়ি পুরোনো হয়ে গেল ?’’ বড়ই কবিতায় পেয়েছে আজ সৃজনকে ।

‘‘আমি কি তাই বলেছি নাকি ? জানো আমার মনে হয়, ওই দেবদারু বাগানে রাতের বেলা ঠিক কিন্নর কিন্নরিরা নেমে আসে । হাতে হাত ধরে খেলা করে বেড়ায় । আর বিপাশার জলে বুড়ো আঙ্গুল সমান লম্বা জলপরীরা স্নান করতে নামে । একে অপরের গায়ে জল ছিটিয়ে খিল খিল করে হেসে চাঁদের আলোয় মিশে যায় ।’’ মানালির শীতল বাতাস, প্রিয় মানুষটির নিকট সাহচর্যে আর এই স্বপ্নালোকিত সন্ধ্যা শিঞ্জিনীর মধ্যে থেকেও টেনে বের করে এনেছে এক কবি স্বত্তা । প্রতিটা মানুষই বোধ হয় কবি । তার গদ্যময় স্বত্তা সেই কবি স্বত্তাকে ঠুকরে ঠুকরে নির্জীব করে রাখে, বাঁচার প্রয়োজনে । একটু থেমে শিঞ্জিনী বলে,

‘‘আমিও তো তোমার মতই সবই নতুন দেখছি । তোমার থেকেও আরও বেশি নতুন বললে ভুল বলা হবে কি ?’’ বলে খিল খিল করে হেসে ওঠে শিঞ্জিনী । দুজনেরই দুই চোখে অনেক না-বলা কথা আধো-ঘুমে-দেখা স্বপ্নের মত জড়াজড়ি করে থাকে ।

****

‘‘হাঁ করে দেখছো কি ? ছ ছটা দশক করে তো দেখেছো ? এখনও দেখা বাকি আছে ?’’ অনেকদিন পরে সরোজিনীর কণ্ঠে যেন মধুচন্দ্রিমার রাতের মিষ্টতা । সেই একুশ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল । তারপর কি করে এই সংসারটায় ষাট ষাটটা বছর কেটে গেছে, বুঝতেই পারেন নি সরোজিনী দেবী । এই দীর্ঘ ষাট বছরে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে তাঁকে । কখনো স্ত্রী, কখনো বৌমা, কখনো মা, কখনো তার আদরের মেয়ের বেবি সিটার ।

নাতনিকে সামলানোর সেই স্মৃতি গুলো তাঁর মনের খাতায় এখনও উজ্জ্বল সুখ স্মৃতি হয়ে আঁকা আছে। কিন্তু স্বামী সব্যসাচীর সাথের প্রথম জীবনের প্রথম দিনগুলো হেমন্তের কুয়াশার মতই অস্পষ্ট। পুরোনো খবরের কাগজের পাতার মতোই অনেক কষ্টে পড়তে হয় সেই দিনগুলির কথা।

''না, তোমায় দেখা শেষ হয় নি। তোমায় আজ আবার নতুন করে দেখতে পাচ্ছি যে। ঠিক যেন সেই বিয়ের পরের তুমি। ঈশ্বর করেন যেন, তোমায় আরও ছটা দশক ধরে এইভাবেই দেখতে পাই।''

''ইসস, এই বুড়ো বয়সে আলহাদ দেখো। লোকে দেখলে বলবে কি ? হাতটা তো ছাড়ো ?''

''কোন শালা বলে আমি বুড়ো। বুঢঢা চোগা তেরা বাপ। এই দেখো, আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখো। কোন চামড়া কুঁচকে নেই । চুল দেখো সব কটা কালো। দাঁত দেখো। ই ই ই ই। একটাও নকল না। এবার বলো, আমি বুড়ো ? আর হাত ধরছি, বেশ করেছি, নিজের বউ-এর ধরেছি। অন্যের বউ-এর তো ধরিনি।''

সরোজিনী দেবী লাজুক হাসেন তার অশীতিপর স্বামীর এই বালখিল্যপনায়। তারপর ছদ্ম ক্রোধ দেখিয়ে বলেন ''খবরদার, আমার বাবা তুমি তুলবে না বলে দিচ্ছি। তাহলে কিন্তু আমি কুরুক্ষেত্র করে দেব।'' সব্যসাচী বাবু হেসে বলেন ''তুমি কৌরবপক্ষ হোয়ো। আমি পান্ডব। অবশেষে জয় আমরাই।'' গত ষাট বছর ধরে স্ত্রী কুরুক্ষেত্র করবে বললেই তিনি উত্তর করেন।

'হ্যাঁ তা তো বলবেই। আমাকে মারতে পারলেই তো তোমার হাড় জুড়োয়।'' সরোজিনী দেবীর সেই চিরাচরিত ডায়ালগ।

''আচ্ছা, শোনো না, আজ এই সুন্দর সন্ধ্যেতে ঝগড়া করো না। লক্ষী সোনা।'' সব্যসাচী বাবু স্ত্রীকে মানাতে সচেষ্ট। ''আমাদের কত দিনের ইচ্ছে বলো, মানালি বেড়াতে আসার .... সেইটা যে এই ভাবে সম্ভব হবে ভাবতে পেরেছিলে ?''

''তুমি তো সেই এই বছর যাবো, পরের বছর যাবো করে পিছিয়েই দিতে। তারপর তো তোমার বাঁ দিকটা পড়ে গেল। অবিশ্যি,মিষ্টি পরে আমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু তুমি মানুষটাকে একলা ফেলে যেতে আমার মন চায় নি।''

''কি করবো ? জীবনের বেশির ভাগটাই তো প্রথমে সন্তানদের প্রতিষ্ঠিত করতে কেটে গেল। সেই সত্তরের দশকের কলেজের শিক্ষক, এতো কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা তো পেতাম না। তাই আমাদের সখ আহ্লাদের ওপর রাশ টানতে হয়েছিল। আর তারপরে বুড়ো বয়সে নাতি-নাতনিদের দেখভাল। যাই হোক, এটা তো মানবে যে, ভাগ্যিস কাজটা করেছিলাম। তাই আজ এই সুন্দর সন্ধ্যেতে তুমি, আমি এই বিপাশা নদীর ধারে . . . তোমার মনে পড়ে, নিরঞ্জন এসে সব সইসাবুদ করিয়ে নিয়ে গেলো ?''

''হ্যাঁ মনে আছে, আমরা দুজনেই সই করলাম। তারপর তুমি তো ড্যাংডেঙ্গিয়ে চলে গেলে।''

''হ্যাঁ, কি করব। বলে কয়ে তো আর আসে না। তার এক বছর পরে তুমি। এই সৃজন যখন আমার চোখ দুটো পেল, ভাবলাম এর চোখে আমি সারা দুনিয়াটা আরও অনেক বছর দেখতে পাবো। কেবলমাত্র আমার সরোজকে আর পাবো না।''

দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার পরে এই সৃজনই শিঞ্জিনীকে নাম লিখিয়ে দিয়েছিল মেডিকেল কলেজে। দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার প্রতিক্ষার্থীদের তালিকায়। তখন থেকেই এদের মধ্যে মন দেওয়া-নেওয়া। বিয়ে আর শুভ দৃষ্টি সম্পন্ন হয় দুজনেই দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার পরেই।'' সরোজিনী দেবী বলেন।

''সৃজনের শরীরে ভর করে, সরোজ, যখন তোমার সঙ্গে দীর্ঘ ষাট বছর পরে দ্বিতীয় বার শুভ দৃষ্টি হল, তখন আমার সকল রোমকুপ রোমাঞ্চিত। বিশ্বাস করো, একটুও বাড়িয়ে বলছি না।''

প্রশংসার আন্তরিকতাটাকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে করতে সরোজিনী দেবী বলেন,

‘‘শিঞ্জিনীর শরীরে ভর করে শুভদৃষ্টির সময় তোমাকে আমারও মনে হল আমি দ্বিজ হলাম । দ্বিতীয় বার জনম নিলাম । চক্ষুদান সার্থক আমার ।’’

‘‘সরোজ মনে আছে, সেই বিয়ের পরে আমাদের প্রথম রাতের কথা ? আজ রাতে তোমাকে সেই জড়িয়ে ধরব নাকি ?’’

‘‘যাহ, তুমি ভারি অসভ্য । বুড়ো হলে, তাও আদেখলেপনা গেল না ।’’

‘‘দেখো, আমার সাথে আরও নিদেন পক্ষে পঞ্চাশ বছর কাটাতে হবে । একেবারে শুকনো কাটাতে চাও নাকি ?’’

‘‘একদম অসভ্যতা করবে না । আমি চললাম ।’’ শিঞ্জিনী উঠে হোটেলের দিকে হাঁটা লাগায় । ‘‘আরে আরে এই শোন না, যাচ্ছ কোথায়’’, বলে পেছনে পেছনে সৃজন ।

Swarvanu Sanyal — Software engineer living in Naperville, Illinois. I regularly write poems, fictional works like short stories, short plays and non-fictional works like essays in different topics.

প্রেম

শাশ্বতী বসু

ঃ বাচ্চুটা — এখনো কেন যে আসছে না — অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। লীনা একটু দেখবি ? বলতে বলতে চিন্তিতভাবে উষালতা লীনার পড়ার ঘরের দোরের সামনে এসে দাঁড়ান। চিন্তার ভাঁজ তাঁর সর্ব অবয়বে।

ঃ ভেবো না মা এসে যাবে খন। ওতো এমনিই। তুমি তো জানোই। হয়তো বা মলিদের বাড়ীতে বসে গেছে আড্ডা মারতে।

ঃ হবেও বা। অন্যমনস্ক ভাবে উষালতা আবার ফেরেন নিজের ঘরের দিকে।

কথাগুলো লীনা মাকে আশ্বস্ত করার জন্য বললেও মনে মনে চিন্তা না করে পারে না। বাচ্চু ওর দাদার মেয়ে। বয়স আট — গ্রেড থ্রিতে পড়ে — একই স্কুলে যেখানে লীনা পড়ে। লীনার গ্রেড্ টেন্ — স্কুল ছুটি হয় চারটেয়। আর বাচ্চুর তিনটেতে। ঘড়ির কাঁটা প্রায় পাঁচটার দিকে। তবে কোথায় গেলো মেয়েটা। তবে বাচ্চুর সম্পর্কে ''কোথায় গেলো মেয়েটা'' সংক্রান্ত প্রশ্নটা নতুন নয়। না বলে দেরী করে বাড়ী ফেরা — এটা বাচ্চু প্রায়ই করে। করে ওর অস্বাভাবিক পশুপ্রেমের জন্য। না বলাটা ভুল হোল। বলা উচিৎ ওর অস্বাভাবিক জীবপ্রীতিই এর জন্য দায়ী। জীবের প্রতি দুর্বলতা ওর সহজাত। সে জীব রাস্তার কুকুর বেড়াল পাখিই হোক বা গরীব গুর্বোই হোক তাতে কিছু আসে যায় না।

লীনাদের বাড়ী — এই বড় রাস্তা থেকে মিনিট তিনেক হাঁটা একটি লেনের উপরে।

গাড়ী ঘোড়ার উপদ্রব কম। তাই রাস্তায় অলসভঙ্গিতে ঘুরে বেড়ানো ওই চারপেয়ে জীবদের সংখ্যাও বেশী। তাদের সংখ্যা এবং তাদের হালহকিকত সব বাচ্চুর জানা। এই দুদিন আগে হঠাৎ একদিন আবার বাচ্চু উধাও হয়েছিল। তাকে পাওয়া গেছিল রাস্তার মোড়ে একটি বড় অফিসবাড়ীর বিরাট উচুঁ টিনে বাউন্ডারী ওয়ালের কাছে। সেখানে সে একটি বেহিসেবি কুকুর ছানার আটকে যাওয়া মাথাটি বাউন্ডারী ওয়ালের তলার একটু ফাঁক থেকে বের করার চেষ্টা করছিল। কুকুর ছানাটি অসাধারণ কৌতুহল প্রবণ বলতে হবে। না হলে কেনই সে তার ছোট মাথাটি ঠেলেঠুলে ভেতর দিকে ঢুকিয়েছিল কে জানে। বাচ্চু সেখানে বসে বসে চেষ্টা করছিল তার মাথাটি বের করে আনার জন্যে। কুকুর ছানাটি কুঁই কুঁই করে কাঁদছে আর বাচ্চু অসহায় আকুলতায় ছোট একটা কাঠি দিয়ে বাচ্চার মাথাটা যেখানে আটকে গেছে সেখানকার মাটি একটু সরিয়ে দিতে চেষ্টা করছে। বাচ্চুর তখন কি চেহারা। মনে হচ্ছে কি যেন কি হয়ে যাচ্ছে। লীনা সেই অবস্থায় বাচ্চুকে আবিষ্কার করে। লোকজন ডেকে বাচ্চাটিকে উদ্ধার করে হাসিমুখ আর চোখভরা জল শুদ্ধ বাচ্চুকে ঘরে ফিরিয়ে আনে সে। সে অবশ্য বেশ কয়েক সপ্তাহ আগের কথা। আজ আবার কি হল কে জানে।

সামনে জলখাবারের প্লেটটা সরিয়ে রেখে লীনা উঠে দাঁড়ায়।

ঃ দাঁড়াও একটু ঘুরে আমি রাস্তা থেকে। দেখি কোথায় তোমার আদরের নাত্নী।

ঃ হ্যাঁ তাই দেখ। কি আর করবি ? হাতের সব আঙ্গুলতো আর সমান হয় না। উষালতা বলেন কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গিতে। যেন বাচ্চুর এই স্বভাবের জন্য তিনিই দায়ী।

ফাল্গুনের শেষ। দিন এখন বেশ বড়। পাঁচটা বেজে গেলেও রাস্তার দুপাশে বড় গাছগুলোর মাথায় এখনও রোদ দেখা যাচ্ছে। গরম নেই। বেশ ঝিরঝিরে একটা ঠান্ডা বাতাস লীনার চোখে মুখে লাগতে থাকে। লীনা তাদের বাড়ীর সামনের রাস্তা ধরে কিছুদূর হাঁটতেই চোখ পড়ে ছবিকে। উল্টোদিক থেকে আসছে। ছবি বাচ্চুর সাধের বন্ধু মলির দিদি। বাচ্চু ওদের বাড়ী গেছে কিনা সেটা ওকে একবার জিজ্ঞেস করে নেবে — ভাবে লীনা।

তার আগেই ছবি এগিয়ে এসে বলে –

ঃ তুমি বাচ্চুকে খুঁজতে যাচ্ছো তো ? আরে দেখো কি কান্ড । ওকে দেখে এলাম । তোমাদের স্কুলের হেড্ মিসের বাড়ীর সামনে পেয়ারা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে । বললো তোমাদের বেড়াল নাকি গাছের ওপরে গিয়ে আর নামতে পারছে না । আটকে আছে.....

ঃ আমাদের বেড়াল ? আমাদের বাড়ীতে আবার বেড়াল কোথায় ? জ্বালালে দেখছি । যা ভেবেছি তাই । বলে লীনা চলতে শুরু করে । বিরক্তিতে তার ছবিকে কিছু কুশল প্রশ্নও করা হোল না ।

ঃ বাচ্চুর তো সব পথের বেড়ালই নিজেদের । বলে হাসতে হাসতে ছবি নিজের পথ ধরে ।

লীনার এবার আরো রাগ হয় । দাঁড়াও আজ দেখাচ্ছি মজা বাচ্চুকে । ওর পশু প্রেমের এবার বারোটা যদি না বাজাই তো আমার নামই নয় ।

হন্ হন্ করে এগিয়ে যায় লীনা – ওদের হেড্মিসের বাড়ীর দিকে । দূর থেকেই দেখা যায় বাচ্চু রানীকে । স্কুল ইউনিফর্মে দাঁড়িয়ে আছেন । ফর্সা মুখ উত্তেজনায় লাল – উর্দ্ধমুখী, দৃষ্টি একটি পেয়ারা গাছের উঁচু ডালের দিকে । হস্তে ধৃত লাল টিফিন বক্স ঢাক্না খোলা । মুখে বলছে.....

ঃ আয় আয় আস্তে আস্তে নেমে আয় । এই দেখ্ দুধ রেখেছি এলেই দুধ দেবো ।

এই সব বলে বলে টিফিন বক্সটি নাড়াচ্ছেন তিনি ।

লীনা এগিয়ে এসে ঠাস্ করে এক চড় কষায় বাচ্চুর মুখে ।

ঃ তোকে আমরা খুঁজছি আর তুই এসব করছিস এখানে । বাঁদর মেয়ে । বাচ্চুর চড় খেয়ে কিছু এলো গেলো বলে মনে হয় না । তিনি এখন সম্পূর্ণ অন্য জগতে । কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই । চড় খাওয়া লাল লাল হয়ে যাওয়া গালে হাত বুলোতে বুলোতে বলে –

ঃ দেখোনা ফুলদি একটু চেষ্টা করে ওকে নামাতে পারো নাকি ? নামতে পারছে না এত উঁচুতে উঠে গিয়েছে । কি করে উঠলো ও বলো তো ?

আরো রাগতে গিয়েও বাচ্চুর মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হয় লীনার । কি রকম অসহায় আর করুন লাগছে বাচ্চুকে । মনে হচ্ছে যেন বেড়াল বাচ্চা নয় ওরই বাচ্চা গাছের উঁচু ডালে আট্কে আছে ।

লীনা নরম সুরে বলে –

ঃ দেখ্ ও ঠিক নেমে আসবে । যেমন উঠেছে তেমনি নামতেও পারবে । হয়তো একটা পাখি টাখি দেখে লাফ দিয়ে ওপরে উঠে গিয়েছিল । এবার ঠিক ওমনি করেই ঝটিতি নেমে আসবে ।

কথা বলতে বলতেই লীনা দেখতে পেলো সত্যি সত্যি বেড়াল বাচ্চাটা অনেকটা নেমে এসেছে ।

ঃ তোমার কথাই সত্যি ফুলদি । দেখো কেমন আস্তে আস্তে নাম্ছে । ওরা একদম মানুষের মত তাই না ? ভয়ও পায় পড়ে যাবে বলে তাই না ?

ঃ হ্যাঁ আর তাই না তাই না করতে হবে না । পথের ধারে পড়ে থাকা বইয়ের ব্যাগটা একহাতে তুলে অন্য হাতে বাচ্চুকে আকর্ষণ করে লীনা ।

ঃ এবার চলো — বাড়ীতে ফিরে সবাইকে উদ্ধার করো।

ঘটনার বেশ কিছু পর। ইতিমধ্যে বাচ্চু বড় হয়েছে। গ্রেড্ থ্রি থেকে ফাইভে উঠেছে। কিন্তু তার দয়া দাক্ষিণ্য ভালাবাসার বহর ও জীবে প্রেম একটুও না কমে উত্তরোত্তর বাড়তে শুরু করেছে। লীনারা সবাই যার পর নাই বিরক্ত। কিন্তু বাচ্চু অনড়, অচল ও অটল। আগে জীবেপ্রেমের সীমানা রাস্তায় সীমাবদ্ধ ছিল। এখন তারা উঠে এসেছে বাড়ীর চৌহদ্দীর মধ্যে। উঠোনে চারটে কুকুর। বারান্দায় গোটা কয়েক বেড়াল এবং সিঁড়ির ঘরে একটি মুমূর্ষ পাখী। পাখীটির একটি পা ও ডানা ভাঙ্গা। ঝড়ের পরে রাস্তার বাদাম গাছের তলা থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাই বলে রাস্তার কুকুর বেড়ালদের রেসকিউ মিশনে ধামা চাপা পড়েছে এটা বললে ভুল হবে। সেটার পরিধি আরো মারাত্মক ভাবে বিস্তৃত হোয়েছে। সম্প্রতি যেটা ঘটেছিল সেটার কথা আর বলার নয়।

একদিন রবিবারের শান্তিপূর্ণ মধ্যহ্নে নিদ্রার সময়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বাচ্চু লীনার ঘরে ঢোকে। লীনা তখন সুপ্তি আর জাগরণের মাঝামাঝি জায়গায় আরামে অবস্থান করছে।

ঃ ফুলদি ফুলদি আলকাত্রা কি ভাবে তুলবো ? বলো না তাড়াতাড়ি আলকাত্রা কি ভাবে তোলা যায় ?

ঃ কি তুলবো ? বিরক্তিতে ধড়মড় করে উঠে বসে লীনা।

ঃ আলকাত্রা।

ঃ কোথা থেকে তুলবি ? কিসের থেকে তুলবি ?

ঃ গা থেকে তুলবো —

ঃ কার গা থেকে ?

ঃ কুকুরের গা থেকে। বাচ্চুর অম্লান স্বীকারোক্তি। এবারে বলবে তো কি ভাবে তুলবো ?

ঃ ওঃ তুই আবার একটা কান্ড বাঁধিয়েছিস ?

ঃ কান্ড আবার কি ? রাস্তার সারানোর আলকাত্রার ড্রামে একটা কুকুর পড়ে গিয়েছিল। ওকে তুলেছি ড্রাম থেকে এখন ওর গা পরিষ্কার করতে হবে। কি দিয়ে করবো বলো ?

এতক্ষণে বাচ্চুর শ্বাস সমান হয়। পরিষ্কার চোখে তাকায় লীনার দিকে। লীনা এবার যেন শক্ খায়।

ঃ তুই কুকুরকে আলকাত্রার ড্রাম থেকে তুলেছিস ? যদি কামড়ে দিতো ?

ঃ হ্যাঁ কামড়ে দেবে। বললেই হল। তখন ও কি রকম কাঁদছে। তুমি যখন কাঁদো তখন কামড়াতে পারো ? অকাট্য যুক্তি। লীনা আর কথা বলে না। মার পুরোনো কাপড় থেকে একটা শাড়ী তুলে ওর হাতে দেয়। আর কেরোসিনের জারিকেনটা হাতের ইশারায় দেখিয়ে দেয়। গনেশকে সঙ্গে নিয়ে যা ও আলকাত্রা তুলবে। পরে লীনা জেনেছিল শুধু একটা জারিকেন বা একটি পুরনো কাপড়ে কিছুই হয় নি। বাচ্চুর এই পরিষ্কার পর্বে সাহায্য করতে আসেপাশের কাকীমা বৌদিরা ও তাদের পুরনো কাপড় ও জারিকেন ভর্ত্তি কেরোসিন পাঠিয়েছেন তাদের গনেশদের হাত দিয়ে এবং তারা তাদের জানলা দিয়ে এই স্বর্গীয় দৃশ্য অবলোকন করেছেন।

সুতরাং এই সমস্ত উৎসাহ পেয়ে বাচ্চুর সেবাকার্যটির খরচ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল হু হু করে। শুধু কুকুর বা বেড়াল জাতীয় জীবই নয়। তার কাজ কর্মের আওতায় মনুষ্য নামক জীবটি এবং তাদের অভাব অনটনের দিকটিও এবার ঢুকে পড়ে।

সচরাচর উষালতা দেবী বড় মেয়ে লীনার পড়ার ঘরে ঢোকেন না খুব যদি না দরকার পরে। হঠাৎ একদিন এই রকম একটি দরকারে তিনি এসে ঢোকেন লীনার ঘরে, এবং বলেন –

ঃ বাচ্চুর সোনার হারছড়াটা ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে রেখেছিলাম একটা ছোটো বক্সের মধ্যে – সেটা দেখছি না কেন রে ? কাল ওর জন্মদিন। কালিংপঙ থেকে সোনা আসছে। গেলো কোথায় হারটা ?

ঃ সেকি ? ওটা পাওয়া যাচ্ছে না ? ওটা ছাড়া তো কেলেঙ্কারী কান্ডই হবে কাল। খুঁজে দেখো ভালো করে – আরো খোঁজো। লীনাও ব্যস্ত হয়।

লীনারও মনে ছিল না বাচ্চুর জন্মদিনটার কথা। কাল তো ১৯শে ফেব্রুয়ারী বাচ্চু তেরোতে পড়বে।

সোনাদা, বৌদি কালিংপঙ থেকে আসছে। বাচ্চু ওদের বড় মেয়ে। কালিংপঙ এর ঠান্ডায় শরীর ঠিক থাকে না বলে ও কলকাতায় ওর ঠাকুরমাদের সঙ্গে থাকে। কিন্তু লীনাকে ও পিসি না বলে দিদিই বলে। অনেকেই জানে না যে বাচ্চু লীনার দাদার মেয়ে। যাইহোক বাচ্চু সবসময় ভোগে বলে ওর জন্মদিনটা একটু মনোযোগ দিয়েই করা হয়। দাদা বৌদিরও এই সময় এই জন্মদিন উপলক্ষে কলকাতার বাড়িতে আসা হয়।

দাদা মেয়ের পাঁচবছরের জন্মদিনে খুব সুন্দর একছড়া সোনার হার বাচ্চুকে দিয়েছিল। নয় নয় করেও হারটার ওজন একভরির ওপরে হবে। প্রতি জন্মদিনে নতুন জামা ও চন্দনের ফোঁটার সঙ্গে বাচ্চু ওই হারটা পরে। তবে ? ওটা না হলে তো চলবে না কাল। সুতরাং লীনা গাত্রোস্থান করে। ঘন্টা দুয়েক ধরে সারা বাড়ীর সব ড্রয়ারগুলো হাটকেও লীনা কিছু পায় না। দুঃশ্চিন্তায় লীনার কপালে ভাঁজ পড়তে থাকে। তবে কি বাচ্চু কোথাও রেখেছে ? রোজকার সান্ধ্যভ্রমণ শেষ করে বাচ্চু ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই লীনা গিয়ে ধরে বাচ্চুকে।

ঃ এই সোনার হারটা কোথায় ?

ঃ কোন হারটার কথা বলছো ?

ঃ তোমার ওই সবে ধন নীলমনি একটা হারই আছে – অনেকগুলো নেই। তাই কোন্‌টার কথা বলছি তুমি ভালভাবেই জানো।

ঃ ওটা আছে – মিন্ মিন্ করে বাচ্চু বলে।

ঃ নিশ্চই আছে। ওর পাখা নেই যে উড়ে যাবে।

ঃ কিন্তু কোথায় আছে ? তোর কাছে ? কোথায় রেখেছিস ? উত্তেজনায় গড় গড় করে বলে যায় লীনা।

ঃ না আমার কাছে নেই – অন্য একজনের কাছে আছে।

ঃ সেকি ? অন্যজনের কাছে মানে ? কার কাছে ? কে সে ?

ঃ বুলির কাছে। বাচ্চু বলে।

ঃ বুলির কাছে ? মানে ? বুলিকে কেন দিয়েছিস ? বিস্ময়ে লীনার বাক্‌রোধ হয়ে আসে।

ঃ ওর বাবা নেই, দাদা নেই – তাই টাকাও নেই। ওর মা বিছানায় শুয়ে থাকে – বুকে ব্যথা। তাই ওষুধ কেনার জন্য ?

ঃ তুমি তোমার হারটা দিয়ে দিলে বুলিকে ওষুধ কেনার জন্য ?

ঃ দিলাম তো। বাবা আবার আমাকে কিনে দেবে। ওর তো বাবা নেই।

মাথায় হাত দিয়ে লীনা বসে থাকে । সারা বাড়ী স্তম্ভিত হয়ে গেছিল বাচ্চুর এই কাজে । বলাই বাহুল্য সে হার উদ্ধার করা যায় নি । বুলি অস্বীকার করেছিল যে ওকে বাচ্চু হার দিয়েছিল । বাচ্চুর বাবা থানা-পুলিশ করতে চেয়েছিল । বাচ্চুর কান্নাতে সবাইকে নিরস্ত্র হতে হয়েছিল ।

এই ঘটনার পর বাচ্চুর সেবাকার্যে বিশেষ করে অর্থকরী সেবাকার্যে একটু ভাঁটা পড়েছিল । তবে কুকুর বেড়াল ও পক্ষীপ্রেমে ভাঁটা পড়ে নি । সেটা চলছিল । লীনাদের বাড়ীতে মায়া বলে একটি মেয়ে ছোটোবেলা থেকে কাজ করে । ১৮/ ১৯ বছর বয়সী মায়ার বিয়ে দেবার দায়িত্ব মোটামুটি লীনাদের ওপরই বর্ত্তেছে । মায়ার মা আসে । তাদের অভাব অনটনের মধ্যে কি ভাবে মায়াকে পাত্রস্ত করা যায় সেই কথাই চলে লীনার মার সাথে । স্রোতা অনেক । তারমধ্যে বাচ্চুও আছে ।

ঃ লীনা হোস্টেলে থাকে আজকাল । কলেজে পড়ে । তার এসব কিছু কিছু কানে যায় । লীনার মাও চেষ্টা করেন । মায়ার জন্য ভালো একটি ওদের উপযুক্ত ছেলে খুঁজতে । বাচ্চুও চেষ্টা করে ।

ঃ একদিন লীনা দেখে একটি মেয়েকে সাথে করে বাচ্চু হোটেলের বাইরে দাঁড়িয়ে ।

ঃ ফুলদি তোমাকে খুঁজছিলাম আমরা — বাচ্চু বলে ।

ঃ আমাকে খুঁজছিলে ? কেন ? কি দরকার ? লীনা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে ।

ঃ এই তো ও আমার বন্ধু । মায়ার জন্য একটি ছেলের খবর এনেছে । মায়ার বিয়ের জন্য । ছেলে শুধু — পাঁচহাজার টাকা cash চায় । তা পেলেই মায়াকে বিয়ে করবে ।

ঃ এ কে ? লীনা গম্ভীর স্বরে বাচ্চুর সঙ্গিনীকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে ।

ঃ ও - ও বুলি — ওই সম্বন্ধটা এনেছে মায়ার জন্য । ছেলে মানে পাত্র নাকি খুবই অনেষ্ট আর পরিশ্রমী । ওর হাতেই পাঁচহাজার টাকাটা দিতে হবে ।

লীনা বেশ বিরক্তবোধ করছিল বাচ্চুর পাকা পাকা কথায় । ওগুলো একদমই মানাচ্ছিল না যেন ওর মুখে । কে যে ওর মাথায় এগুলো ঢুকিয়েছিল কে জানে . . . . এই সব ভাবতে না ভাবতেই ‘‘বুলি’’ নামটা শুনে বিদ্যুৎ চমকে যায় লীনার মাথায় ।

ওঃ এই সেই বুলি ? যে কিনা বাচ্চুর একভরি সোনার হার নিয়ে দিব্যি অস্বীকার করেছিল ।

লীনার রক্তস্রোত দ্রুত বইতে থাকে । কি করা যায় এই মেয়েটাকে এবার ? এই মিথ্যেবাদী মেয়েটাকে কি ভাবে শাস্তি দেওয়া যায় । চঞ্চলতাকে যতদূর পারা যায় সংযত করে লীনা বলে —

ঃ তোরা একটু বস । আমি বাথরুম থেকে ঘুরে আসি । ওর হ্যান্ড ব্যাগটা টেবিলে রেখে বাথরুমে ঢুকে যায় । বাথরুম থেকে ঘরে ফিরে লীনা দেখে বাচ্চু ওর এ্যাকোরিয়মের মাছগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে । আর টেবিলের পাশেই বুলি বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে চিউয়িংগাম চিবোচ্ছে । পাশেই টেবিলের ওপর হ্যান্ডব্যাগ লীনার ।

ঃ তুমিই বুলি ? শুরু করে লীনা ।

ঃ হ্যাঁ আমি — বুকের কাপড়টা আরো টেনেটুনে বুলি নির্বিকার বলে ।

ঃ তুমি মায়ার জন্য পাত্রের খোঁজ এনেছো ?

ঃ হ্যাঁ এনেছি। পাঁচহাজার দিলেই ছেলেটি মায়াকে বিয়ে করবে। তবে টাকাটা আগে আমার হাতে দিতে হবে। আমি ওকে দিয়ে দেবো। বুকে আবার হাত দেয় বুলি।

লীনা ততক্ষণে একটি শ্বাসরোধকর দৃশ্য দেখে ফেলেছে। বুলির ব্লাউজের মাঝখানটা বেশ উঁচু হয়ে আছে। সেখানে স্বচ্ছ শাড়ী ভেদ করে দেখা যাচ্ছে। লীনার পার্স এর সোনালী বল্টু দুটো।

লীনার বোধশক্তি হারিয়ে যায়। খালি মনে হয় এতদূর স্পর্ধা এত সাহস এই মেয়েটার ? লাফ দিয়ে উঠে এসে লীনা একটানে বুলির ব্লাউজের মধ্যে থেকে ওর গোলাপী পার্সটা বের করে ফেলে।

ঃ এটা ? এটা কি করে তোমার ব্লাউজের মধ্যে এলো ? এটা তো আমার। কি করে তুমি নিলে ? না বলে ? তুমি চুরি করলে ? তুমি চোর এবার দেখো শাস্তি কাকে বলে ? বলে লীনা ইন্টারকমে হাত বাড়ায় নিচের সিকিওরিটিকে ডাকার জন্য।

এবার লীনার জন্য আরো বড় চমক অপেক্ষা করছিলো। লীনার হাত বাড়ানো দেখে বাচ্চু ঝাঁপিয়ে পড়ে লীনার হাতের ওপর।

ঃ এটা কোরো না ফুলদি — এটা কোরো না। বুলিকে পুলিশ ধরিয়ে দিও না। ওরা খেতে পায় না — তাই তোমার পার্স নিয়েছে। ও তো এমনি এমনি নেয় নি। কোথায় পাবে ও টাকা ? ওরা তো ভীষণ গরীব।

লীনা জানে না — ও কি শুনছে — কে ওর সামনে দাঁড়িয়ে। শুধু বুলিকে হাত দিয়ে দরজাটা দেখিয়ে বলে —

ঃ এক্ষুনি বেরিয়ে যাও নইলে . . . . . নইলে . . . . .

অবরুদ্ধ ক্রোধে লীনা আর কিছু বলতে পারে না। বাচ্চু মুখ ঢেকে তখনও কেঁদে চলেছে।

Saswati Basu — Profession: University Teacher in Economics, lives in Sydney.

I enjoy this beautiful life thoroughly. Particularly I enjoy listening to songs, reading books on sociology, short stories, and travelling around. I love watching drama, good cinema and tennis. I also love to experiment with new cooking recipes and share them with our friends. Believe in donating money to voluntary organisations for the people in need.

সম্মোহন

অর্পিতা চ্যাটার্জী

রিন্ রিন্ করে ঘন্টা বাজছিলো। মাথার ভেতরের অবিরত বেজে চলা রিনরিনে শব্দটার সাথে ক্রমশঃ মিশে যাচ্ছিলো বাইরের ঘন্টার শব্দ। আর সাথে সাথে বুকের ভেতর থেকে উঠে আসছিলো পোষা কষ্টটা। এটাকে আর বাড়তে দিতে চায় না পৃথা। বেয়াড়া কষ্টটা যে অনেকদিনের পরিচিত। একটু প্রশ্রয় দিলেই দশ গোলে হারিয়ে ঠিক চোখ দিয়ে দুফোঁটা জল বের করে ফেলবে ও। পৃথা জানে। অনেকবার ওর জন্য পৃথাকে লোক জনের সামনে অপ্রস্তুতে পড়তে হয়েছে। তাই ওকে উপেক্ষা করার জন্য পিছন থেকে ভেসে আসা কথোপকথনে মন দেয় সে।

— তুমি কি কাল যাচ্ছ ?

নারে ভাই, আজ আমার নাইট আছে। বিকেলেই রওনা হবো।

— সেকি গো ? পৌঁছাতে তো অনেক দেরি হয়ে যাবে।

— হ্যাঁ এই পুজো হয়ে গেলে, খেয়েই স্টার্ট করবো।

— ও বাবা !

ব্যস্ত প্রবাসীর চেনা জীবনালেখ্য। স্মৃতি আর শিকড় জড়াজড়ি করে বয়ে নিয়ে চলেছে ভারতীয় ঐতিহ্য এই বিভুঁইতে। অশেষ ব্যস্ততা সত্ত্বেও বুকের ভেতরটা ছুঁতে যায় ফেলে আসা শৈশব-কৈশোর — হয়তো বা অর্ধেক যৌবন। তাই মাতালের মতো ছুটে আসা উৎসবভূমিতে। আর মস্তিষ্ক চোখ রাঙিয়ে শাসন করে হৃদয়কে। বলে, ওরে মন এই যে রইলো তোর কাজের ফিরিস্তি।

চোখ খুলে সামনে তাকায় পৃথা। ছোট্ট পঞ্চ প্রদীপের আলো উঠছে, নামছে, দুলছে অনভ্যস্ত হাতে। বাম হাতে ঘন্টাটা সমান তালে নাড়াবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন যিনি, তিনি আজকের পুজোর পৌরোহিত্যের দায়িত্বে থাকা ব্যস্ত তথ্যপ্রযুক্তিবিদ। পঞ্চপ্রদীপের সর্ষের তেল মাখানো সলতে গুলো চোখ টেনে নেয় পৃথার। পুরোহিতের হাতের সাথে সঙ্গত করে পৃথার চোখ। ডানদিক থেকে বামদিকে আলতো চামর বোলাবার মতো করে আলোটা নাচে। যেন পৃথারই ডানচোখ থেকে বামচোখে উত্তাপ বিতরণ করে চলে আলোটা। প্রদীপের আলোটাকে অনুসরণ করতে করতে কি যেন হয়ে যায় পৃথার। সম্মোহন কি একেই বলে ? অনেক দূরে ছায়াময় গঞ্জের এক অনাবিল ছেলেবেলা কি করে যেন উজ্জীবিত হয়ে ওঠে সাত সমুদ্দুর পারের এই বিভুইঁতে। এদেশে আসার আগে তার এক বৌদি মজা করে বলেছিল তাকে, ''এইবার কন্যে তবে বিভুঁইকে স্বভূমি করলেন।'' কন্যাটি তখন অনেক প্রতিবাদ করেছিল, ''না না দেখো না কয়েক বছরেই ফিরবো।'' ফেরা হয়নি। ফেরা হয়না। কারোরই। সেই ফেলে আসা ছিন্নমূল শৈশব-কৈশোর — অর্ধেক যৌবন শুধু হাতছানি দেয়, মোচড়ায়, কাঁদিয়ে চলে বাকি অর্ধেকটা যৌবনকে। হয়তো প্রৌঢ়ত্বে, বার্ধক্যেও। এতদিনে কন্যে জেনেছে সেকথা। আর তার পরেই তার পোষা কষ্টটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে আবার। ওই তো তার চোখের সামনে স্পষ্ট ছবির মতো ফুটে উঠেছে পিতলের দোয়াত। তাতে রয়েছে আলতা, আর তাতে ডোবানো বাঁশের কঞ্চির কলম। ওই দিয়ে নাকি মা সরস্বতী রাতের বেলা সবার চোখের আড়ালে বই খাতায় আশীর্বচন লিখে দিয়ে যান। অদৃশ্য সে লেখা আমার খুব ভালো কাজ না করলে, সবার মঙ্গলকামনাকারী মন না থাকলে যে দেখতে পাই না। আর খুব ভালো কাজ করতে গেলে ছোট বেলা থেকেই খুব ভালো করে পড়াশুনা করতে হয়। এ কথা সেই কোন ছোট্টবেলায় শুনেছে পৃথা। সরস্বতীপুজোর আগের সন্ধ্যায়, ছোড়দাদুর কোলে বসে, তাঁর শীর্ণ বুকে হেলান দিয়ে। ''তাই জন্য মা সরস্বতীকে বইখাতাও দিতে হয়, তাই না দাদু ?'' দাদু

বলেছিলেন, ''আর সঙ্গে দোয়াত কলম।'' সেই পিতলের দোয়াত-বাঁশের কলম কি করে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে পৃথা। সাথে ছোড়দাদুর শীর্ণ হাতের বেষ্টনীর স্পর্শ। এসব যে সে তিরিশ বছর আগেই ফেলে এসেছে। আজ কেন এই হৈচৈয়ের মাঝে সম্পূর্ণ অন্য পরিবেশে অন্য এক ঝকঝকে সারস্বত আরাধনার মাঝে কেবলই ভেসে ওঠে সেই লোডশেডিং এর ছায়াময় সন্ধ্যে, ছোট্ট দুয়ারের এককোনে ছোট ঠাকুমার লালপাড় শাড়ি ঘিরে বানানো প্যান্ডেল আর হ্যারিকেনের আলোয় দুলতে থাকা পরদিনের পুজোর জন্য জোগাড় করা পঞ্চ পল্লব এর ছায়া। যেন কোন জন্মের স্মৃতি। ছোড়দাদুর কোলে বসে 'মা সরস্বতীর' গল্প পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে গিলতে থাকা পাঁচ বছরের ছোট্ট পৃথা যেন অন্য কেউ। আজকের এই বিভুইয়ের কন্যের সে যেন কোনোদিন কেউ ছিল না। শীত করছে কেন তার এই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হলঘরে? তবে কি দেহের সমস্ত উত্তাপ শোষণ করছে তার শিকড়? ঢোঁক গেলে পৃথা। গলাও শুকিয়ে কাঠ। গুড় গুড় করছে বুক আর গলার মাঝখানটা।

— ''দাদু, খড়ি মাটি দিয়ে কাল লিখতে হবে?''

— ''না না, তুই নতুন শ্লেট-পেন্সিলেই লিখবি।''

— ''তবে যে মা বললো — হাতে খড়ি?''

— ''ওতেই হবে, হাতে খড়ি মানে বিদ্যাদেবীর সামনে প্রথম লেখাপড়া শেখা।''

— ''আমি তো লিখতে জানি। সঅঅঅব। আমি এবছর ইস্কুলে ভর্তি হবো জানো? মা বলছে।''

— ''জানিতো। তাও হাতে খড়ি দিতে হয়। নইলে মা সরস্বতী জানবেন কি করে যে তুই লিখতে শিখেছিস? আর না জানলে তোর কলমে বাস করবেন কি করে সারাজীবন?''

— ''কলমে?''

— ''কলমে, জিভে, মাথায়, বুদ্ধিতে সব জায়গায়। নইলে বড় হবি কি করে?''

বড় হয়েছে নাকি পৃথা? সেই সন্ধ্যে, সেই আলো-আঁধারি, সেই লালপাড় শাড়ির প্যান্ডেল, পঞ্চপল্লবের অলৌকিক ছায়া, বহুবছর আগে শেষ বারের মতো শোনা ছোড়দাদুর গলার স্বর-সব যেন একসঙ্গে জড়াজড়ি করে বুক ঠেলে উঠে আসছে পৃথার। আর পারে না সে। বাঁ হাতের কড়ি আঙ্গুল দিয়ে চোখ থেকে চট করে সরিয়ে নেয় এককোঁটা জল কেউ দেখার আগেই। পরদিন সকালে বিদ্যাদেবীর মূর্তির সামনে নতুন শ্লেট-পেন্সিলে ছোড়দাদুই তাকে হাত ধরে লিখিয়েছিলেন 'অ-আ-ক-খ, এ-বি-সি-ডি, ১-২-৩-৪, 1-2-3-4 সব। সে সব কিছু লিখতে জানা সত্ত্বেও। তার হাতেখড়ি হয়েছিল। এখানেও হয়েছে তিনটে হলুদ প্রজাপতির, কিছুক্ষণ আগেই। কোথায় গেলো তারা? আরতি থেকে চোখ সরিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তিনটেকেই দেখতে পেলো পৃথা। ওই তো হলঘরের অন্যদিকে হুটোপুটি করছে। একটু আগেই হাত ধরে লেখানোর সময় চোখ গোলগোল করে ভয়ে ভয়ে বসেছিল। একজন তো কেঁদেই ফেললো ভয়ে। শেষ হতে বললো, 'মে উই প্লে নাও?'' ওরা অবশ্য 'অ- আ' লেখেনি। শুধু 'এ-বি-সি-ডি'। দেখেছে পৃথা।

আরতি প্রায় শেষ। ছোট্ট চামর দোলাচ্ছেন পুরোহিত। বাম হাতের ঘন্টাটা এখন হস্তান্তরিত হয়েছে সহ পুরোহিতের হাতে। সত্যিই ঘন্টা এবং প্রদীপের সমন্বয় করা কঠিন এই অনভ্যস্ত পৌরোহিত্যের জন্য। এবার অঞ্জলি। একরাশ হলুদ শাড়ি আর কারুকাজ করা পাঞ্জাবি ভিড় করে আসছে পুস্পাঞ্জলির জন্য। পৃথাও ফুল নিলো। অঞ্জলি ভর্তি ছিল না যদিও। তারপর তাকালো মা সরস্বতীর মুখের দিকে। আচ্ছা মা সরস্বতী বলে কেন সবাই? বৈদিক সরস্বতীর ধারণা অনুসারে সরস্বতী তো পুণ্যসলিলা নদী মাত্র। তবে কি বুদ্ধি, বিবেচনা, চেতনার বিকাশে দেবী সরস্বতীই প্রধান সহায়, তাই কি মা? সবাই যখন শুদ্ধচিত্তে মাথায় হাত বুলিয়ে ফুল নিচ্ছে তখন পৃথার মনে এসব প্রশ্ন ঘোরাফেরা করে। এই আর এক সমস্যা তার। ঠিক সময়ে ঠিক দিকে মনোনিবেশ করা বুঝি আর এজীবনে হলো না। মনটাই বুঝি ফেলে এসেছে অন্য কোনো খানে। সেই যেখানে ফেরা হয়নি। সেই যেখানে ফেরা হয়না কোনোদিনই। সেই যেখানে ফসল কাটার শেষে আদিগন্ত মাঠের

কোনায় তার ছোট্টবেলার একতলা স্কুলবাড়ি। মাঠের মাঝে একটা দ্বীপ। অজস্র গাছের জঙ্গলে ঘেরা একলা একটা পুকুর। দূর থেকে দেখলে ধূসর মাঠের মাঝে দ্বীপ ই সেই ছোট্ট পৃথার কাছে। কতবার মনে মনে সে চেয়েছে একটিবার কাছ থেকে তার দ্বীপটিকে দেখতে। তা দেখেছিলো বৈকি। শুধু দেখা নয়। একলা সে দ্বীপ তাকে সন্ধান দিয়েছিলো আরো এক অপূর্ব কিছুর। সামান্য কয়েক বছরের জীবনে তখন ও পর্যন্ত তার সেরা আবিস্কার। বৈঁচি ফল। সারা দ্বীপ জুড়ে বৈঁচি গাছের জঙ্গল। জঙ্গলের মেঝেয় পাতা লাল-কালোর কারুকাজ করা বৈঁচি আর বৈঁচি। কোঁচড় ভরে বৈঁচি কুড়িয়েছিল সে সেদিন। কি আনন্দ। ভেবেই পাচ্ছে না এতো বৈঁচি নিয়ে সে কাকে কাকে ভাগ দেবে। আজকের এই বিভুঁইয়ের কন্যে পৃথাও কি আর জানে এক কোঁচড় বৈঁচি নিয়ে কি করতে হয়? এতো আনন্দ কি আর সে পেয়েছে আর কখনো? কোথাও? কিছুতে?

''ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমঃ নিত্যং, সরস্বতঃই নমঃ নমোঃ।'' — এই রে, আবার বুঝি পিছিয়ে পড়লো সে এসব আবোল তাবোল ভাবতে গিয়ে। চোখ বুজে মন্ত্র আবৃতি করে সে মনে মনে।

''বেদ-বেদান্ত-বেদাঙ্গ, বিদ্যাস্থানেভ্যঃ এবচ।'' হলঘর গমগম করছে এতগুলি মানুষের সমবেত মন্ত্র উচ্চারণে। নির্দিষ্ট উচ্চারণে সমবেত মন্ত্রের একটা অনুভব আছে। শিরশির করে শরীর। অবশ হয়ে আসে অনুভূতি। মা সরস্বতীরও কি তাই হয়? তাই কি উনি জেগে ওঠেন এতগুলি ছিন্নমূল মানুষের ছেলেবেলাকে প্রাণপণ আবাহনে করার টানে? নিজেদের শিকড়কে না ভুলবার, বিভুঁই এর মাটিতে রোপন করে, লালন করার আকুল সমবেত আর্তিকে মা সরস্বতী কি করে এড়িয়ে যাবেন? একবারের জন্য ও কি তিনি আসবেন না এই বিভুইতে? ভদ্রাবতীর তীরে আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে যেমন তিনি এসেছিলেন আকুল মেঘমল্লারকে উপেক্ষা না করতে পেরে।

''যা কুন্দেন্দু তুষারাহার ধবলা, যা শ্বেত পদ্মাসন যা বীণাবরদন্ডমন্ডিতভুজা, যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা'' চোখ বন্ধ করে মনের কোণে কোনজন্ম থেকে যত্ন করে গুছিয়ে রাখা শ্বেতশুভ্রা 'জ্যোৎস্নাময়ী' মূর্তিকে সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করে পৃথা। সে জানে না, প্রদ্যুম্ন যে না জেনেই তাকে মেঘমল্লারে বন্দিনী করেছিল, সেই সুরপ্রিয়া জ্যোৎস্নাময়ী দেবী সত্যি? নাকি গুণাঢ্যের বন্দিনী আত্মবিস্মৃত, সম্মোহিত স্নেহময়ী দেবী সত্যি? নাকি গুণাঢ্যের বন্দিনী সেই আত্মবিস্মৃত, সম্মোহিত স্নেহময়ী দেবী সত্যি? নাকি তিনি কলহাসিনী পুণ্যতোয়া স্রোতস্বিনী? নাকি তিনি মা?

''মা গো, এতগুলি সম্মোহিত মানুষ কে জানে কোন মেঘমল্লারের টানে সম্মোহিত হয়ে কত যুগ ধরে আবাহন করেছে তাদের ছেলেবেলার স্বপ্নপুরীর। প্রাণপণে তুলে নিতে চাইছে সেই ছেলেবেলায় শোনা মেঘমল্লারের সুর তার উত্তরসূরীকে। সফল করো মাগো সেই আর্তি। নইলে কোন প্রদ্যুম্ন আসবে তাদের সম্মোহন ঘোচাতে?'' পৃথার বন্ধ বামচোখ থেকে একফোঁটা জল নেমে আসে।'' ওই যে তিনটি ফুটফুটে হলুদ কুঁড়ি, প্লাস্টিকের শ্লেটে ইংরাজী অক্ষর লিখেছে আজ তোমার সামনে বসে। একবার একটি বারের জন্য তাদের দাওনা সেই আলো-আঁধারের সন্ধ্যেটুকু, তাদের নিজের নিজের ছোড়দাদুর কোল চিনিয়ে দাওনা প্রদ্যুম্ন আর সুরদাসের বন্দিনী আত্মবিস্মৃত দেবীকে। তাদের নিজের ছোড়দাদু বা সেরকমই শীর্ণ কিন্তু পরম আদরের কোনো কোলে বসে হ্যারিকেনের আলোয় থাকা ভৌতিক ছায়া দেখতে দেখতে ভালো করে পড়তে শেখার অনেক আগেই নিজের নিজের মতন করে চিনে নিকনা মেঘমল্লারকে, তোমাকে, দেবী সরস্বতীকে। ওদের জন্য জেগে ওঠ মাগো একটিবার। নইলে যে হারিয়ে যাবে মেঘমল্লারের সুর।''

এই সুরের খোঁজেই যে তিষ্ঠোতে পারে না পৃথা কোথাও, কোনোখানেই। দেশপ্রেম কিনা জানে না পৃথা। কোনোদিনই ভাবেনি সেভাবে। কতবার কেবল বুক মোচড়ানো নীরব কান্নার শেষে নিজেকে বলেছে —

'দেশ তো তোমার নেই জানতাম, ছিলো ও না কোনোকালে।

আগু পিছু? সেও গেছে বুঝি? পথ নেই ফেরাবার?

পলকে হারালে অতীত তোমার, পলকে ভবিষ্যৎ।

সামনে কেবল একপদ ভূমি, সত্য বর্তমান।'

ওই যে বৈঁচি ফলের জাজিম পাতা পৃথার নিজস্ব জঙ্গল ঘেরা দ্বীপ, ঐযে আলো-আঁধারি ঘেরা সন্ধ্যের অলৌকিক পরিবেশ, ভালো করে পড়তে শেখার আগে, বিভূতিভূষণ নামক মহীরুহটির ছায়ার স্পর্শ পাবার বহু আগেই দাদুর কাছে প্রথমবারের জন্য মেঘমল্লারের গল্প শুনে শিহরিত হওয়া আর পাশে দুলতে থাকা লালপাড় শাড়ির ছাউনির মধ্যে হ্যারিকেনের আলোয় সরস্বতী প্রতিমার সিল্যুয়েট। ওই তো পৃথার মেঘমল্লার। সে সুর পৃথার মনে যে প্রেম সৃষ্টি করেছিল, তা চিরকালীন। কোনো প্রদ্যুম্নের মন্ত্রপূত জলের সাধ্য ছিল না তাকে সেই সম্মোহন থেকে উদ্ধার করার। এমনকি এই যে হলুদ পাঞ্জাবির অতীন, চোখ বন্ধ করে পুষ্পাঞ্জলী দিচ্ছে তার পাশটিতে দাঁড়িয়ে, তার এতো কালের ভালো-মন্দ, জানা-অজানার পরম প্রিয় সাথী, তার আত্মার দোসর, সেও জানেনা সেই মন্ত্রপূত জলের সন্ধান। এ তার নিজস্ব। তার একান্ত গোপন প্রেম। তার সম্মোহিত মনের নেশার মেঘমল্লার। প্রত্যেকের যেমন থাকে। এইখানে উপস্থিত প্রতিটি মানুষের নিজের ফেলে আসা শৈশব-কৈশোর — আর অর্ধেকটা জীবন তা জানে।

''ওঁ সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কোমললোচনে, বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী বিদ্যাংদেহি নমস্তুতে।'' এতগুলি প্রার্থী হৃদয় এবার মাথা ঠেকিয়ে দেয় ভূমিতে। মা সরস্বতীর পায়ে। যে যাই বলুক তিনি মা ই। পৃথা নিশ্চিত জানে।

Arpita Chatterjee — Postdoctoral Research Associate, Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE-68198

বেবীসিটার জয়েস

বানী ভট্টাচার্য্য

আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার ছয় বছরের বড়ো ছেলে বলে উঠলো, 'মা কথা বলছো না কেন ? তুমি জয়েসকে বলে দেবে না তো ? তাহলে জয়েস আমাকে খুব শাস্তি দেবে বলেছে। তুমি কাজ করো বলে, আমাকে তো জয়েসের কাছে যেতেই হবে। মা, তুমি প্লিস জয়েসকে বোলো না যে আমি তোমাকে বলে দিয়েছি টিমকে ও শাস্তি দিয়েছে।'

একথাগুলো মনে করলে, এখনো আমার শরীর শিরশির করে কেঁপে ওঠে। সেদিন নীলের কথা শোনার পরে মুখটা আমার অবশ হয়ে গিয়ে, মুখদিয়ে আর কথা বার হচ্ছিল না। আমার চোখে জল এসে গেল আর শরীরের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠলো রাগে। এ কি কথা শুনলাম আজ ? নীলের চোখেমুখেও ভয়ের রেখা। তখন আমার চেতনা ফিরলো। আমি নীলকে জড়িয়ে ধরে, গালে একটা চুমু খেয়ে বললাম, 'কিছু ভয় নেই তোমার সোনা, তোমাকে আর জয়েসের কাছে যেতে হবে না।' 'তা কি করে হবে ? তোমাকে তো কাজে যেতেই হবে। তুমি তো বলেছো আমাকে আগে, ওই হাসপাতালে আর কেউ বেশী ডাক্তার নেই, যে রুগীকে অজ্ঞান করতে পারে। তোমাকে ছাড়া লোকের সারজারি তো বন্ধ হয়ে যাবে।' আমি বললাম, 'আমি কাজ ছেড়ে দোবো।' 'তাহলে খুব মজা। জয়েস আর টিমের হাতের ওপর দাড়াঁতে পারবে না। বোলো তুমি জয়েসকে, আমি ওর কথা শুনিনি। তোমাকে আমি সব কথা বলে দিয়েছি। ও আর তো টিমকে মারতে পারবে না তাহলে। আমি কিন্তু রায়ন আর ববকে মিস করবো। ওরা আমার বন্ধু হয়ে গিয়েছিল।' এই বলে মহা আনন্দে এক পায়ে নাচতে নাচতে নীল চলে গেল ওর খেলার ঘরে।

আমি কিন্তু তখনও বিশ্বাস করতে পারছি না, কি কথা শোনালো আমাকে আমার বড়োছেলে নীল আর আমারই ছোটো ছমাসের ছেলে টিমের সমন্ধে।

সেটা ছিলো উনিশ সো তিয়াত্তর সাল। টিম তখন মাত্র পাঁচমাসের। আমার আগের বেবীসিটার, যার বাড়িতে আমি টিমকে রেখে কাজ করতে শুরু করেছিলাম, তার স্বামীর কাজ ট্রানফারের হওয়ার জন্যে, তাকে ইলিনয় ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল তিনমাস পরেই। সে খুবই ভালোবাসতো নীল, টিমকে। আমাকে সপ্তাহে একদিন কি দুদিন দিন ছাড়া, রাত্রেও ছেলেদের বেবীসিটারের কাছে রাখতে হতো, যেহেতু আমার স্বামী সোলো হিসাবে একলাই ডাক্তারি করতেন। আমরা কাগজে এডভাটাইজ করে কয়েকজনের থেকে বেছে জয়েসকেই ঠিক করেছিলাম বেবিসিটার হিসেবে।

প্রথম এক-দুমাস দেখলাম, জয়েস খুব ভালোভাবেই আমার ছেলেদুটোকে রাখছে। সুন্দর পরিস্কারপরিচ্ছন্ন বাড়ি তার। দুটো ছোটো ছোটা ছেলে, প্রায় নীলের বয়েসী। নীলের সঙ্গে ভাব করে নিয়েছিলো। যদিও নীল তখন ক্যাথলিক স্কুলে যেতো আর ওরা অন্য স্কুলে যেতো। প্রত্যেকদিন যখন ছেলেদের তুলতে যেতাম, তখন লক্ষ্য করতাম, ছেলেদুটো পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। নীলকে প্রথম দুসপ্তাহ জিজ্ঞেস করতাম জয়েস কেমন — নীল বলতো, 'খুব ভালো।' তারপর আমি আর জিজ্ঞেস করতাম না।

এরকম করে দুমাস কেটে গেলো। টিমের বয়েস হলো ছমাস। আমি কিন্তু লক্ষ্য করলাম, টিম যেন কয়েকদিন ধরে আর তেমন মিষ্টি করে হাসছে না, আর হামাগুড়িও তেমন দিচ্ছে না। কেমন যেন নির্জীব মনে হচ্ছে টিমকে। প্রথমে কয়েকদিন ভাবলাম, হয়তো কিছু অসুখ করছে। কিন্তু সেটাও নয়, কারন খাচ্ছে ঠিরমত। জয়েসকে জিজ্ঞেস করাতে জয়েস বললো, 'সব ঠিক। কোনো গন্ডগোল নেই। নীল টিম দুজনেই খুব ভালোছেলে। তোমার ভাবনা করার কোনো কারন নেই। টিমও খুব ভালো, কোনো কান্নাকাটি নেই।'

আমার কিন্তু কেন জানি না, টিম ঠিক আছে মনে হতো না কয়েকদিন ধরে। নীলকে জিজ্ঞেস করাতে, কি করে দিন কাটে ওখানে টিমের, তখন নীল বললো, 'টিম তো প্লেপ্যানে থাকে, আর ওর মধ্যে অনেক খেলনা আছে, তা নিয়ে থাকে। তারপরের দিন আমি বললাম আমার স্বামীকে, 'তুমি কি লক্ষ্য করছো, টিম এখন একদম কাঁদে না।' 'বিনয়েন্দু আমাকে ধমক দিয়ে বললো, 'তুমি আচ্ছা তো ? ছেলে কাঁদলেও কমপ্লেন করবে, আবার না কাঁদলেও তোমার অস্বস্তি।'

আমার কিন্তু মনটা খচখচ করতে লাগলো। উইকেন্ডে আমার ছুটি ছিলো। টিম ঘুমোচ্ছিলো ক্রিবে। বিনয়েন্দু গিয়েছিল অফিস করতে। আমি ব্রেকফাস্ট খাবার পর নীলকে পাশে বসিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলাম, বলোতো নীল আমাকে 'তুমি জয়েসের কাছে গিয়ে কি কি করো ?' 'আমি খেলি রায়ন আর ববের সঙ্গে।' 'টিম কি করে ওখানে।' 'টিম তো প্লে প্যানে থাকে।' 'কতক্ষন থাকে ?' 'তা আমি জানিনা। আমি তো স্কুলে যাই।' বলেই নীল উঠে যাচ্ছিল। আমি নীলকে চেপে ধরে আবার কাছে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আর তুমি যখন বাড়িতে আসো, তখন টিম কোথায় থাকে ?' নীল বললো, 'প্লেপ্যানে।' আবার উঠে যাচ্ছিল নীল। আমি জোর করে ওকে আমার কোলে বসিয়ে বললাম, 'জয়েস, টিমকে নিয়ে কোলে করে বেড়ায় না ?' 'না', বলেই নীল বললো, 'আমি কিছু জানিনা। মা, আমাকে কিছু জিজ্ঞেস কোরো না, প্লিস।'

নীলের শেষ কথাটা আমার মনে কেমন যেন ধাক্কা মারলো। আমি নীলের পেছনে পেছনে গিয়ে বললাম, 'আমি তোমার মা। তোমাকে রোজ বেবীসিটারের বাড়িতে রাখতে আমার একটুও ভালো লাগে না। কিন্তু আমার তো উপায় নেই। প্লিস এসো আমার কাছে। আমাকে সব বলো।' নীল হঠাৎ একটু চিৎকার করে বললো, 'না, আমি তোমাকে সব কথা বলতে পারবো না।' আমি অবাক হয়ে ওর দিকে বড়োবড়ো চোখ করে তাকালাম, কারন এরকম ভাবে উত্তর আমাকে নীল আগে কখনো দেয়নি। নীল আমার দিকে চেয়ে কেঁদে ফেললো। তারপরেই ছুটে আমার দিকে না চেয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো।

আমিও ওর পেছনপেছন গিয়ে দরজা খুলে ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'আমি তোমার মা, আমাকে বলবে না তো কাকে বলবে ? কি হয়েছে বলো। তোমাকে কি জয়েস মেরেছে ?' 'না, আমাকে মারে নি। কিন্তু,' বলেই নীল চুপ করে গেলো। আমি বললাম, 'তবে, কি হয়েছে বলো। মাকে কি কোনো কথা লুকোতে আছে ?' তখন নীল আমাকে যা বললো তার সারাংশ হলো এই। নীল একটা ঘরে বসে খেলা করছিল রায়নের সঙ্গে আর পাশের ঘরে টিম ছিল প্লেপ্যানে। হঠাৎ নীল শুনলো, টিম এক বীভৎস আকাশ ফাটানো স্বরে কেঁদে উঠলো। নীল ভয়পেয়ে আর কৌতুহলে ছুটে গিয়েছিল টিমের ঘরের দিকে। সেখানে গিয়ে নীল দেখলো, টিম মাটিতে হামাগুড়ি অবস্থায় আর জয়েসের একটা পা টিমের আঙুলের ওপর চাপিয়ে জয়েস দাঁড়িয়ে আছে। নীলকে দেখেই, জয়েস টিমকে কোলে নিয়ে নীলের দিকে এগিয়ে এসে রাগ করে বলেছিল, 'নীল, তুমি যা দেখলে তোমার মা কে বলবে না। তাহলে টিম আরও শাস্তি পাবে। জানো তো, তোমার মা কাজ ছাড়তে পারবে না, আর তোমাকে আমার কাছে আসতেই হবে।' তখন রায়েন ঘরের মধ্যে এসে বললো, 'কি হয়েছে। টিম কাঁদছে কেন অমন করে।' জয়েস বললো, 'ক্ষিদে পেয়েছে টিমের। তোমরা খেলতে যাও।'

একথা শুনে আমি আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কিছুক্ষন চুপ করে থাকাতে নীল আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, তুমি জয়েসকে বোলো না, তোমাকে আমি বলে দিয়েছি।' আমি বললাম, নীলকে জড়িয়ে ধরে, 'নীলসোনা, তোমাদের আর কোনোদিন জয়েসের কাছে যেতে হবে না। আমি কাজ ছেড়ে দোবো।'

আমার মনের ব্যথা গুমরে গুমরে উঠতে লাগলো। চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছি জয়েসের মোটা শরীরের চাপে টিমের ছোট্টছোট্ট আঙুলগুলো নীল হয়ে যাচ্ছে। ভাগ্যিস ভেঙে যায়নি। ছোট্ট শিশু, সবে হামাগুড়ি দিতে শিখেছে। আর একটু বড়ো হয়েছে, তাই সারাক্ষণ প্লেপ্যানে বসে না থেকে, কোনোরকমে ম্যানেজ করে, ছোট্ট জায়গায় সারাদিন বন্দী হয়ে থাকার বন্ধন থেকে, ছোট্ট মাথার বুদ্ধি খরচ করে সবে নেমে এসেছিল প্লেপ্যান থেকে, তাতে এমনই শাস্তি পেল, যে, সে একেবারে চুপ হয়ে গেল শরীর আর মনের দিক দিয়ে। তখন বুঝলাম কেন টিম আর তেমন আগের মত নেই। কেন এত নির্জীব। কেন হামাগুড়ি দিচ্ছে না, তেমন করে। ছোট্টহলেও কত আঘাত পেলে এমন হতে পারে। সবই আমার দোষ।

তখন আমার স্বামী এসে দাঁড়ালেন সামনে । সব কথা শুনে, তিনি ঠিক করলেন, আমাদের লিস্টের মধ্যে পরের যে বেবীসিটারের নাম আছে, কেরল বলে, তার কাছেই আমাদের ছেলেদের রাখবো । আমরা এদেশে ইমিগ্রান্ট । আমাদের এত অসুবিধের মধ্যে, আর এরকম প্যাথেটিক ব্যাপার মনে করে আমাদের নিজেদের মনের ওপর অত্যাচার করে, জয়েসের সঙ্গে আমাদের ছেলে নিয়ে কথাকাটাকাটি না করাই ভালো ।

আমরা সেদিনেই তক্ষুনি কেরলকে ডেকে তার বাড়িতে গিয়ে, সেই সোমবার দিন থেকেই ছেলেদের রেখে আসা ঠিক করলাম । জয়েসকে ডেকে বলে দিলাম, আর রাখবো না ওর কাছে ছেলেদের । জয়েস অত্যন্ত মনক্ষুন্ন হয়ে বললো, 'কেন ? তোমার ছেলেরা এত ভালো । আমি ওদের নিজের মতন করে দেখতাম ইত্যাদি, প্রভৃতি ।' আমার স্বামী কথা আর না বাড়িয়ে বলে দিলেন, 'অনেক ধন্যবাদ । তোমাকে আমাদের মনে থাকবে ।'

হ্যাঁ, সত্যিই আমাদের জয়েসের সব কথা এখনও মনে আছে আর তার সব ব্যবহার । তার চেহারা মনে পড়লে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দেয় । ভাবি এখন মনে মনে প্রায়ই, এখন কোনো বেবীসিটার ঐরকম ব্যবহার করলে, তার কি অবস্থা হতো ?

Bani Bhattacharyya — Since my childhood my passion was to write my day to day events. Born in Kolkata, I came to the USA in 1960's. Being married in America, I was busy to fulfill my professional duty and taking care of my family. Now, I live in Barrington, IL and enjoy writing novels, short stories and poems. Many of my articles are now published in Amazon and in various magazines.

অনুবাদ

উপলব্ধি

পুষ্পা সাক্সেনা (অনুবাদ সুজয় দত্ত)

রোজকার মতো আজও সকাল হল যথাসময়ে । এতদিন ঘুম ভেঙে উঠে দেবেশ প্রথমেই জিজ্ঞেস করত, 'কটা বাজল ?'

'সাতটা বেজে গেছে বড়সাহেব, দয়া করে উঠুন এবার । অফিস-টফিস যেতে হবে তো, নাকি ?' আমি মজা করে বলতাম ।

'ধ্যাত্তেরি, নিকুচি করেছে অফিসের — একটু আরাম করে ঘুমোবারও জো নেই ।' শীতের সকালের মিঠে ঘুম থেকে জাগতে জাগতে গজগজ করতো দেবেশ ।

আজ সকালে চোখ খুলতেই দেখি বিছানা থেকে দেবেশ উধাও । সামনের দেওয়াল-ঘড়িতে দেখলাম মাত্র ছটা বাজে । গেল কোথায় ?

তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে গায়ে শালটা জড়িয়ে নীচে নামলাম । দেখি ও গম্ভীর মুখে পিছনের দরজার গ্রীল ধরে একদৃষ্টে বাইরে তাকিয়ে আছে । ভোরের যে মনোরম দৃশ্য ও জীবনে কখনো দেখেনি, তাই উপভোগ করছে বোধহয় ।

'বাঃ, আজ অফিস নেই তো, তাই এত সকাল সকাল ওঠা হয়েছে বাবুর । নাহলে সাড়ে সাতটার আগে চোখই খোলে না ।' আমার পরিহাসের উত্তরে চুপ করে রইল ও । ওর চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর আজই প্রথম দিন । আমাদের দুজনেরই মনটা সকাল থেকে ভারী হয়ে রয়েছে । গত তিরিশ বছর ধরে আমরা দুজন একসঙ্গে অফিসে গেছি । আজ থেকে আমাকে একাই যেতে হবে । সারা রাত দুজনেই বিছানায় এপাশ ওপাশ করেছি, ঘুম আসছিল না । মহিলারা তো সারাদিন ঘর-গেরস্থালির পঞ্চাশ রকম কাজ করে সময় কাটাতে পারে । কিন্তু দেবেশের মতো পুরুষমানুষ, যে জীবনে কুটোটিও নাড়েনি কখনো — সে কী করবে ? যদি ঘরে ওকে সঙ্গ দেওয়ার লোক থাকত, তাহলে আলাদা কথা । বাড়ীর গিন্নীদের মুখে অনেকসময়েই অভিযোগ শোনা যায় যে স্বামী ব্যস্ত, সময় দিতে পারে না একদম । স্বামী রিটায়ার করলে তাকে চব্বিশ ঘন্টা কাছে পাওয়ার সম্ভাবনার কথা ভেবে পুলকিত হয় তারা । আমার জামাইবাবু যখন রিটায়ার করলেন, মালতীদির — মানে আমার বড়দির — খুশী আর ধরে না ।

'সত্যি বলছি রে সুমি, এই বয়সেও তোর জামাইবাবুকে সারাক্ষণ চোখের সামনে দেখতে পেয়ে কী ভাল যে লাগছে ! এতগুলো বছর নিজের ঘরেই অতিথির মতো ছিল মানুষটা ।'

'আরে আসল কথাটা অন্য । ঘরে তোমার ফাইফরমাশ খাটার জন্য চব্বিশ ঘন্টার একটা লোক পেলে — সেটাই বল', জামাইবাবু মুচকি হেসে রসিকতা করতেন ।

আমার সংসারে ব্যাপারটাই আলাদা । এই যে এখন থেকে প্রতিদিন বিকেলে দেবেশ আমার ফেরার অপেক্ষায় হা-পিত্যেশ করে বসে থাকবে, ওর যা ইগো তাতে এটা মেনে নেওয়া শক্ত । এতবছর প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ের দশমিনিট আগেই অফিস পৌঁছে যাওয়ার অভ্যেস ছিল ওর । সকালবেলা তৈরী হওয়ার সময় আমি দু-মিনিট দেরী করলেই আমাকে তাড়া দিতে শুরু করত, 'সাড়ে আটটা বাজতে চলল । তোমার ড্রেসিং টেবিল ছাড়ার নামগন্ধ নেই !' শুনে কপালে টিপ পরতে পরতে আমার হাত নড়ে যেত । একদিন বিরক্ত হয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠেছিলাম, 'দেখো, টিপ পরার সময় এরকম জ্বালাতন কোরো না তো ! তোমার কোনো ধারণা আছে অন্য বাড়ীর চাকুরে মহিলারা মেক্ আপ করতে কত সময় নেয় ?'

বড়সড় ড্রেসিং টেবিলটা প্রায়শঃই আমাদের যুদ্ধক্ষেত্র বনে যেত । একইসঙ্গে দেবেশ দাড়ি কামাচ্ছে আর আমি চুল বাঁধছি । কোনোদিন হয়তো চিরুণিটা রাখতে গিয়ে ওর দাড়ি কামাবার জলের গ্লাসটায় একটু ধাক্কা দিয়েছি, ব্যস্, রেগে চেঁচামেচি শুরু করত ও । 'একটু দেখেশুনে হাত-পা চালানো যায় না ? সারা টেবিল জলে ভাসছে । নাও, এখন ন্যাতা নিয়ে এসে জল মোছো । দূর, আর ভাললাগে না এসব —'

প্রতিটা কাজ ঘড়ি ধরে সময় মেপে করা ছিল দেবেশের মজ্জাগত । আমি আবার বরাবরই সময়ের ব্যাপারে একটু অগোছালো । তাড়াহুড়ো করতে গেলেই ছোটখাটো ভুল করা ছিল আমার স্বভাব ।

রোজকার মতো আজও জল গরম হচ্ছে ইমার্সন্ হীটারে । কাল অবধি তো দেবেশ জল গরম হতে না হতেই বাথ্রুমে চানে ঢুকে যেত — আমি চীৎকার করে বারণ করা সত্ত্বেও । আগে চান সেরে আমার আগেই তৈরী হয়ে নেওয়ার সুযোগ ও ছাড়বে ? আমি চাইলেও সে-সুযোগ পেতাম না, যেহেতু সকালের কাজকর্মগুলো শেষ করে নিজের চানের ব্যবস্থা করতে আমার একটু দেরী হতো ।

আর আজ ? খবরের কাগজ পড়বার ভান করে ও আমার বাথ্রুমে ঢোকার আগে পর্যন্ত বাথ্রুমের ধারেকাছেও এল না । আমি বাথ্রুম থেকে বেরোবার পর নিজের দাড়ি কামানো বন্ধ রেখে ড্রেসিং টেবিলের সামনে থেকে সরে গেল । খুব খারাপ লাগল আমার । বললাম, 'আরে তুমি দাড়িটা কামিয়ে নাও না । আমার তো এখনো অনেক সময় লাগবে । শাড়ী পরা হয়নি, চুল শুকোতে হবে —'

— 'না না, পরে করলেও চলবে । তাড়ার তো কিছু নেই ।' ওর ম্লান হাসিতে কেমন যেন একটা দুঃখের ছোঁয়া । দেখে মনটা উদাস হয়ে গেল আমার । মানুষটার এই ধরণের ব্যবহারে তো আমি অভ্যস্ত নই ।

কানে খালি বাজছে রোজ ঘড়ির কাঁটা সাড়ে আটটা ছুঁতে না ছুঁতেই ওর তুমুল শোরগোল, 'কী হল কী ? ব্রেক্ফাস্ট তৈরী হয়েছে না হয়নি ? নাঃ, তুমি আজ লেট করিয়ে ছাড়বে দেখছি । আমি বেরিয়ে পড়লাম, তুমি বাস্-টাস্ নিয়ে চলে যেও ।''

আমার তো মাঝেমাঝে ভয় হতো ও সত্যিসত্যিই না আমায় ফেলে গাড়ী নিয়ে চলে যায় । দূরের অফিস, বাস্ ধরে পৌঁছনো সোজা নয় ।

টেবিলে ব্রেক্ফাস্ট সাজিয়ে রোজকার মতো আজও হাঁক পাড়লাম, 'এসো, খেতে দিয়েছি ।'

— 'তুমি খেয়ে নাও । আমারটা ঢাকা দেওয়া থাক, পরে খাব ।'

— 'এ আবার কী ? আমি জীবনে কোনোদিন একা একা ব্রেক্ফাস্ট করেছি ?' আমি অভিমানী গলায় বললাম ।

— 'এখন থেকে তো সব কাজ একাই করতে হবে । অভ্যেস করে নাও । আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে আর চলবে না ।'

— 'ঠিক আছে, তুমি না এলে আমারও খাওয়ার দরকার নেই, চললাম —'

— 'আসছি, আসছি । চেঁচিও না তো । এখন থেকে অবশ্য প্রতিটি ব্যাপারে তোমার হুকুম না মেনে উপায় নেই ।' স্বরে শ্লেষের আভাস । — 'তুমি মানবে আমার হুকুম ? তাহলে সেদিন সূর্য পশ্চিম দিকে উঠবে ।' আমি হেসে হাল্কা করার চেষ্টা করি কথোপকথনটাকে ।

— 'সে তো এখনই হচ্ছে। বৌ চলল অফিসে রোজগার করতে, আর ব্যাটাছেলে নিষ্কর্মা হয়ে ঘরে বসে রইল ।'

— 'এরকম করে কথা বললে কিন্তু আজই অফিসে ইস্তফা দিয়ে চলে আসব।' আমার গলা কান্নাভেজা শোনায়।

— 'আই অ্যাম্ সরি। আমি তো মজা করছিলাম। নাও, তাড়াতাড়ি করো, এবার সত্যি লেট হয়ে যাবে।'

দেবেশের কষ্ট আমি বুঝি। আমাদের দুই ছেলেমেয়েই অনেকদিন হল বাড়ীর বাইরে। ঘরে একা একা সময় কাটানো চাট্টিখানি কথা নয়। আর কথা না বাড়িয়ে কাপের চা-টুকু তাড়াতাড়ি শেষ করে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

— 'বেরোচ্ছ তাহলে ?' প্রশ্নটা ভেসে আসে আমার দিকে। উত্তরে ওর মুখের দিকে তাকানোর সাহস আমার ছিলনা। চাকরিজীবনে দু-তিন দিন ছুটি পেলেই ও কীরকম হাঁপিয়ে উঠত, সেটা আমার মনে আছে। হয়তো বসে গেল স্কুটার ধুতে, কিংবা বসবার ঘরের আসবাবপত্রগুলো এধার ওধার সরিয়ে নতুন করে সাজাতে লেগে গেল। চিরকাল ওর অন্তর্মুখী স্বভাবের জন্য বাড়ীতে আমাদের বন্ধুবান্ধব খুব একটা আসত না। বাচ্চারা যতদিন ঘরে ছিল, পরিস্থিতি ছিল অন্য। ওদের পড়াশোনার তদারক করা, ওদের সঙ্গে বকবক করা — এসবের মধ্যে দিয়ে সময় আপনা থেকেই কেটে যেত।

— 'ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি ফিরো কিন্তু।' সামান্য হেসে ও বিদায় জানাল আমাকে। কাল অবসর নেওয়ার দিনই ও বলে দিয়েছিল, এখন থেকে অফিসে নিয়ে যাওয়া বা বাড়ী নিয়ে আসার জন্য ওর মুখাপেক্ষী যেন আর না থাকি।

অফিসে পৌঁছে মনে হল সবাই আমার মুখ দেখে আমার মনের ভাব আন্দাজ করার চেষ্টা করছে। এই প্রথম বাস্ ঠেঙিয়ে ট্রাফিক ঠেলে অফিসে আসা তো, মুখে একটা অসহায়তার ভাব লেগে ছিল বোধহয়।

— 'তারপর ম্যাডাম্, শ্রীমানকে ছাড়া অফিসে আসতে কেমন লাগছে ? কখনো তো আলাদা আসতে দেখিনি আপনাদের, তাই —'

— 'সাহেব ঘরে একা একা কী করছেন ?'

— 'আরে, এখন তো আপনিই পরিবারের কর্তা, কী বলেন ?'

এত বিরক্ত লাগছিল আমার যে ইচ্ছে হচ্ছিল সবাইকে ভাল-মন্দ দুকথা শুনিয়ে দি। কিন্তু এই আট ঘন্টা দেবেশ বাড়ীতে একা একা কী করছে, কেমন আছে, এসব ভেবে নিজেই ভেতরে ভেতরে চিন্তিত হয়ে পড়ছিলাম। মন খালি চাইছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ী ফিরতে। ইস্, যদি ওকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য বাড়ীতে থাকতে পারতাম কটা দিন ! অবশ্য এত বছর কখনো মনে হয়নি যে আমার সঙ্গ না পেলে ওর চলছে না। যতদিন কর্মজীবন ছিল, ও ছিল একাই একশো।

এমনিতে সব স্ত্রী-ই হয়তো অল্পবিস্তর মনে করে যে তাদের স্বামীরা ডিক্টেটর। কিন্তু দেবেশের কথা আলাদা। ও ছিল ডিক্টেটরেরও বাড়া। যখন যা বলেছে, চিরজীবন আমাকে মেনে চলতে হয়েছে। ওটাই ছিল আমার নিয়তি। বাচ্চারা যতদিন ছোট ছিল, তাদের ইচ্ছে-অনিচ্ছে-বায়নাক্কা সব আমার মাধ্যমেই বাবার কাছে যেত। কখনো কখনো দেবেশের একতরফা সিদ্ধান্তে আমি ক্ষুব্ধ হতাম, ব্যথা পেতাম। তবু ওর বিরোধিতা করার সাহস হতনা, কারণ সেটা করতে যাওয়া মানেই বাড়ীতে কুরুক্ষেত্র বাধানো।

ওর ইগো কখনোই ওকে একজন সোজাসাপ্টা মানুষ হতে দেয়নি। অনেকসময়েই আমার বা ছেলেমেয়েদের সাধারণ সাধারণ কথাতেও ও চটে যেত। ওর জীবনের ধ্যানজ্ঞান ছিল অফিস আর কাজ। ছুটির দিনেও অফিসের ফাইলপত্র কাঁধে নিয়ে ঘুরত ও। আমার আর বাচ্চাদের ছুটির কথা শুনলেই ওর মুখে বিরক্তির রেখা। ছুটিতে বাচ্চারা তো হইহল্লা করবেই। ওর কানে গেলেই ঝাঁঝিয়ে উঠত, 'ওঃ, এ-দেশের স্কুলগুলোতে এত ছুটি দেয় কেন বুঝিনা বাবা !'

আর সেইজন্যই বাচ্চারা মনেপ্রাণে চাইত বাবা ঘন ঘন অফিস ট্যুরে বেরোক। করুণা, আমার বড় মেয়ে, বাবাকে ভয় পেত বেশী। মাঝেমাঝেই আমাকে জিজ্ঞেস করত, 'বাবার পরের ট্যুর কবে, কিছু বলেছে ? জানিনা কবে আবার একটু ফ্রী

হয়ে থাকার সুযোগ পাব।' ওর ভাই বিনয়ের সুর আবার উল্টো। সে বলত, 'যাই বলিস, বাবা বাড়ী না থাকলে কেমন খালি-খালি লাগে। রাতদিন বাবার বারণ আর নির্দেশ শোনাটা অভ্যেস হয়ে গেছে।' ছোটবেলা থেকেই বিনয়ের রকমসকম একটু আলাদা — যেকোনো পরিস্থিতিতে খুশী থাকতে ভালবাসে ও।

ছেলেমেয়ে বড় হয়ে বাড়ী ছাড়ার পর যে ওদের জন্য দেবেশের খুব মনখারাপ হতো, বুঝতে পারতাম। ওরা ছুটিছাটায় বাড়ী এলে যেন উৎসব লাগিয়ে দিত ও। বাবার এই পরিবর্তিত আচরণ ছেলেমেয়েরাও খুব উপভোগ করত।

যাইহোক, সন্ধ্যেবেলায় মনে অনেক চিন্তা আর আশংকা নিয়ে বাড়ী ফিরলাম। দেখি ডাইনিং টেবিলের ওপর প্লেট ঢাকা দেওয়া গরম চা। কে করল ? এতকাল অফিস থেকে ফিরে চা করা তো আমার দায়িত্ব ছিল !

— 'এটা কী করেছ ? আমি ফিরে চা বসাতে পারতাম না ? আমাকে অপরাধী বানাতে চাও ?'

— 'না না, ভাবলাম ক্লান্ত হয়ে ফিরবে, ঢুকেই এক কাপ গরম চা দেখলে কত খুশী হবে। আমি তো সারাদিন শুয়েবসেই রয়েছি। নাও, এখন চটপট খেয়ে বলো তো কেমন হয়েছে।'

— 'দেখো, কাল থেকে কিন্তু চা আমি করব। নাহলে —', বলতে বলতে আমার গলার স্বর ভারী হয়ে আসে। দেবেশের এই রূপ আমি এত সহজে মেনে নেব কী করে ?

— 'আশ্চর্য ! এতদিন তুমিই অভিযোগ করতে আমি কোনো কাজ করিনা। আর আজ যে কাজ করতে চাইছি, তাতেও তোমার আপত্তি ? নাঃ, লোকে ঠিকই বলে, নারীর মন বোঝা দায়।'

— 'না, আমার সেই আগের দেবেশকেই চাই। তুমি ঠিক সেইরকমই থাকবে — বুঝলে ?' আবেগের আতিশয্যে আমি ওর বুকের ওপর গিয়ে পড়লাম।

— 'এ আবার কী কথা ? রিটায়ারমেন্ট তো সবার জীবনেই আসে। আমার ক্ষেত্রে কোনো নতুন কিছু তো হয়নি। আমি এটাকে সহজভাবে মেনে নিতে পারব না কেন ?' আমার চুলে আদর করে বিলি কাটতে কাটতে বলল ও।

— 'সে ঠিক আছে, কিন্তু রিটায়ারমেন্টের প্রথম দিনেই কেউ এতটা বদলে যায় ?'

— 'আমি বদলে গেছি ?'

— 'না তো কী ? কাল আবধি কোনোদিন এক গ্লাস জল নিজে গড়িয়ে খেয়েছ ? আর আজ আমার জন্য চা করে আমাকে কষ্ট দিচ্ছ ?'

— 'ও, আচ্ছা, এই ব্যাপার ?' দেবেশ হো-হো করে হেসে ওঠে।

— 'এতে হাসির কী হল ?' আমি রাগত স্বরে বললাম।

— 'না, এটা সত্যিই হাসির ব্যাপার নয়। জানো আজ সারাদিন একা একা আমি কী করেছি ? আমার অতীত জীবন নিয়েই ভেবেছি শুধু।'

— 'তার সঙ্গে চা করার কী সম্পর্ক ?'

— 'সম্পর্ক আছে সুমি। অফিস যতদিন ছিল, নিজেকে সবসময় গুরুত্বপূর্ণ ভেবে এসেছি। একবারও তাই মনে আসেনি যে তুমিও আমার মতো অফিস যাও, সারাদিন কাজকর্মের শেষে ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারো। ঘরসংসারের কাজের দায়িত্ব তোমার — এরকমই মনে করেছি চিরকাল। কিন্তু আজ —'

— 'থ্যাংক্স্ ! মনে হচ্ছে রিটায়ারমেন্টের পর বড়বাবুর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছে ।'

— 'ঠিকই বলেছ সুমি । এই নতুন জীবনের জন্য নতুন সব অভ্যেস তৈরী করতে হলে নিজেকে তো বদলাতেই হবে, তাই না ?'

— 'সত্যি করে বলো তো, এসব তুমি মনে মনে মেনে নিতে পারবে ?'

— 'পারতেই হবে । সত্যি বলতে কী, গত কয়েক দিন ধরে এই রিটায়ারমেন্ট জিনিসটা আমার মনের ওপর এমন চেপে বসেছিল যে অন্য কিছু নিয়ে ভাবতেই পারিনি ।'

— 'আর আজ ?'

— 'চা করেছি, সে তো দেখতেই পেলে । এবার থেকে রান্নাঘরেও আমাকে সাহায্যকারী হিসেবে পাবে । সারাজীবন সংসারের কাজে তোমাকে একবিন্দু সাহায্য না করার প্রায়শ্চিত্ত তো শুরু করতে হবে ।' দেবেশের গলায় হাল্কা পরিহাসের সুর ।

— 'তুমি হবে আমার হেল্পার ? অসম্ভব !'

— 'তোমার এই অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রাণপণ চেষ্টা করব । একটা কথা জানিয়ে রাখি — আমি খালি হাতে বসে থাকার লোক নই । অনেকদিন চাকরি করলাম, এবার লক্ষ্য সমাজসেবার ভরপুর পুণ্যলাভ । বুঝলেন দেবী ?'

— 'ওঃ, দেবেশ, তুমি আমায় বাঁচালে । জানো আজ সারাদিন অফিসে বসেছিলাম মনে অপরাধবোধ নিয়ে ?'

— 'কেন ? কিসের আবার অপরাধ ?'

— 'এটাই যে আমি অফিসে আর তুমি বাড়ীতে —'

— 'দূর পাগলী, কী যে বলো ! চলো, আজ আমরা বরং আমার অবসরজীবনের প্রথম দিনটা দুজনে মিলে সেলিব্রেট করি ।'

— 'সত্যি ? কীভাবে সেলিব্রেট করবে ?'

— 'কোথাও একটা লম্বা ড্রাইভে যাই, তারপর ডিনার বাইরেই খাব । চলবে ?'

— 'ওঃ দেবেশ, আমার স্বপ্নেরও অতীত ! কী মজাই যে হবে —'

এইভাবে পৃথিবীতে আরেকজন ডিক্টেটরের পতন হল । আর শুরু হল আমার নতুন জীবন । মেয়েরা যে জীবনের স্বপ্ন দেখে বিয়ের পিঁড়িতে বসে — সেটাই আরকি ।

সুজয় দত্ত — ওহায়োর অ্যাক্রন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানতত্ত্বের (স্ট্যাটিস্টিক্স) অধ্যাপক। জৈবপরিসংখ্যান বিশ্লেষণতত্ত্বের (বায়োইনফর্মেটিক্স) ওপর ওঁর একাধিক বই আছে । কিন্তু নেশা তাঁর সাহিত্যে । সাহিত্য তাঁর মনের আরাম । গত বারো বছরে আমেরিকার আধ ডজন শহর থেকে প্রকাশিত নানা সাহিত্যপত্রিকায় ও পূজাসংখ্যায় তাঁর বহু গল্প, কবিতা, রম্যরচনা ও অনুবাদ বেরিয়েছে । তিনি ''প্রবাসবন্ধু'' ও ''দুকূল'' পত্রিকা সম্পাদনা ও সহসম্পাদনার কাজও করেছেন ।

রম্যরচনা

অবশেষে

তহমিনা জাবিন মমি

অবশেষে, যাওয়ার সময় হয়ে এল আমার । সেই কোন কবে থেকে যেতে চাইছি । সেদিন থেকে যেদিন এদেশের বসন্তকেও আমার মনে হয়েছিল বিশ্রীরকম ঠান্ডা আর স্যাঁতসেঁতে । অক্টোবর মাসের তিন তারিখ ছিল, স্পষ্ট মনে পড়ে । বেশ মোটা একটা সোয়েটার জড়িয়ে সস্তায় পাওয়া হোটেলের বাইরে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছি । আর ঠিক তখনি পাশ দিয়ে তিনটে মেয়ে হাসির রোল তুলে বিব্রত করে দিয়ে চলে গেল, হয়তো বসন্তে এত মোটা সোয়েটার চাপিয়েছি বলেই । এদের শীত লাগেনা নাকি !

একবার সামার হিল-এর বাসার নীচের জাকারান্ডা ফুলের রঙ দেখে বিদ্রুপের হাসি হেসে ব্রিটিশ বাড়িওয়ালাকে বলেছিলাম ''এতো কিছুই নয়, তুমি যদি দেখতে জারুলের রঙ''। বিশ্ববিদ্যালয় চত্ত্বরের সেই সবুজ মাঠটা জুড়ে শুধু বেগুনী আর বেগুনী মখমলে পাপড়ি বিছানো । আর সাথে সাথে সে ফুলের হালকা সুগন্ধ বয়ে আনা গ্রীষ্মের বাতাস । এজন্যই বুঝি নাম মল চত্ত্বর । ভেলপুরি, চা, ফুচকা আর একদঙ্গল ছেলেমেয়েদের, প্রেমিক-প্রেমিকাদের গল্পে হাসিতে মশগুল থাকে জায়গাটা । অনেকদিন হল যাইনি সেখানে । কিন্তু আজো সেই হালকা গন্ধটা পাই মনে মনে । নয় বছর তো কাটিয়ে দিলাম শুধু মুহূর্ত গুনে গুনে, ঐ মিষ্টি সুগন্ধী হাওয়া গায়ে লাগাব বলে ।

সজনে ফুল বিছানো পথে হাঁটব বলে, লেবু ফুলের গন্ধ নেব বলে, সিপাহী বুলবুলের ডাক শুনব বলে কী দীর্ঘ প্রতীক্ষা আমার । উঠোনে মেলা মায়ের শাড়ী মৃদু হাওয়ায় আজ আর ওড়েনা শুধু ।

নীলক্ষেতের পুরনো বইয়ের দোকানের ঘুপচি গলিতে মানুষের ঘামের বোটকা গন্ধ ঘেঁষে ঘেঁষে হাঁটা, এখন সেখানে নতুন বিল্ডিং উঠেছে শুনেছি । সেই একটু বামন প্রকৃতির ছেলেটা, যে বই বাঁধাইয়ের দোকানে কাজ করত, যাকে আমি একটু বেশী টাকা দিয়ে দয়া করতে চেয়েছিলাম কিংবা হয়তো সুবিধাভোগী নাগরিক হিসাবে নিজের অপরাধবোধের ক্ষতে মলম লাগাতে চেয়েছিলাম অথচ সে লজ্জায় আর অস্বস্তিতে না বলে দিয়েছিল । খুব দৃঢ়তার সঙ্গে না বলার মত ব্যক্তিত্ব তখনও ওর তৈরি হয়নি, কিন্তু একদিন হবে জানি । এরপর আবার যদি দেখা হয় কখনো, ওর সঙ্গে না হোক ওর মত অন্য কারো সঙ্গে, আমি আর টাকা দিতে চাইবনা । আমি বরং সেই ছোট্ট ছেলেটার কপালে একটু আদর মেখে দেব । এখন আমার টাকাপয়সা কম বলে নয় বরং ভিতরে যে শূণ্যতা তৈরি হয়েছে সেটাকে পুরিয়ে নিতে ।

এই 'সব পাওয়া'র দেশে থেকেও এত শূণ্যতা কী করে যে আসে কে জানে । সারে সারে সাজানো ভোগ্যপণ্যের দোকানের মাঝে সেই বেমানান জায়গাটা, টাউন হল স্টেশন থেকে বেরিয়ে কুইন ভিক্টোরিয়া শপিং মলে ঢোকার মুখে নীচতলার একটা দোকানের সামনে আমি বহুদিন দাঁড়িয়ে থেকেছি শুধু গন্ধ নেবার জন্য । এক দিদিমা গোছের মানুষ নিবিষ্ট মনে বিভিন্ন ধরনের বাদাম ক্যারামেলাইজড করতেন । দেশে আমরা যাকে মুড়কি বলি ঠিক তেমন । পার্থক্য শুধু খই-এর বদলে এখানে থাকে বাদাম, নানা রকম । আখরোট, কাজু, ম্যাকাডেমিয়া আরও কত কিছু যাদের সবার নাম ও আমি জানিনা । শীতের সময় নতুন গুড়ে ভাজা হত মুড়কি আর অন্য সাদা মুড়ির সঙ্গে অল্প অল্প করে মিশিয়ে সারা বছর ধরে খাওয়া হত । আমার মনে হত কেন শুধু মুড়কি খাইনা আমরা ? ঐ দিদিমার চোখে, খুন্তি নাড়ার ভঙ্গিমায় আমি একই ভালবাসা দেখেছি যেমনটা ছিল আমার নানীর চোখে । নানী আর নেই, তার কবরটা আছে ।

প্রচন্ড বিরক্তি নিয়ে থাকতে থাকতে একসময় খেয়াল করলাম এদেশের অনেক কিছু আমার ভালো লাগতে শুরু করেছে । এই যেমন বসন্তের শুরুতে পাতাবিহীন গাছের ভরতি ম্যাগনোলিয়া, গাঢ় গোলাপী রঙের । কফি শপের আশেপাশে যে একটা গন্ধ ছড়িয়ে থাকে সেটা । অবশ্য আমি কফি খাইনা । সাদা রঙের কাকাতুয়া । গাছ ভরতি সাদা জুঁই । জারুলের

রঙের অন্য একটা লতানো গাছের ফুল, যার নাম আমি জানিনা। নিউটাউন যাবার পথে রাস্তার রেলিং জুড়ে ফুটে থাকে, বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে এবং খুব অল্প সময়ের জন্য। আর বসন্তে দুই একদিন বৃষ্টি হলে গাছের পাতা পচে একটা গন্ধ, একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গন্ধ যেটা ঠিক আমার নানুর গ্রামের সোঁদা গন্ধের মত নয়, আমার ভাল লাগতে শুরু করেছে। খেয়াল করলাম বছরের ঐ সময়টা এলে ঐ গন্ধের জন্য আমি অপেক্ষা করি। আমার কাউকে তখন মনে পড়ে।

ঠিক এই মুহূর্তে এসে মনে হয় এই বিদেশে, কাগজে কলমে এখন সেটা আমারও দেশ বটে, আমি যা কিছু ভালোবেসেছি তার সবই যেন পুরনো কিছুকে ভেবে। এই যেমন সকাল বেলায় শিশির ভেজা গোলাপী ক্যামেলিয়া দেখলেই আমার মনে পড়ত তুলতুলে পাপড়ির স্থলপদ্মের কথা। এতই নরম ছিল সে রঙ, যেন ছুঁয়ে দিলেই মলিন হয়ে যাবে। নিউটাউন এর পুরনো বইয়ের দোকান, কিং স্ট্রিট জুড়ে প্রাণের আবেশ, সেও তো ভালবেসেছি শাহবাগ, আজিজ আর নীলক্ষেতকে মনে রেখে।

এডি এভিনিউর দিকে সেন্ট্রাল স্টেশনের যে গেটটা সেদিক থেকে বেরুলেই দেখা যায় একটা রহস্যময় হলুদ আলো ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। পাশেই একটা ফুলের দোকান, একটা কফি শপ, দুটো স্ন্যাক্সের দোকান আর ভিক্টোরিয়ান আমলের কিছু স্ট্রীট ল্যাম্প। আমি, হয়তো বা শেষবারের মতই ওখানে বসে আছি। তীব্র শীতে ন্যাড়া গাছটায় লেগে থাকা দুচারটে হলদে পাতা শুধু তিরতির তিরতির করে কাঁপছে। ট্রেন আসে যায় অবিরাম।

সে শব্দ ছাপিয়ে আমার চোখে তখন ইতিহাসের বইয়ের পাতা, কানে আসে ছ্যাকড়া গাড়ির শব্দ।

আপাতত আমাকে দেশ টানছে ভীষণভাবে।

আনন্দধারা'র কুড়ি বছরের পূর্তি উপলক্ষ্যে শ্রীজাত সম্পাদিত ও বাতায়ন দ্বারা প্রকাশিত দখিনা পত্রিকা থেকে নেওয়া এই রম্যরচনা।

আমি development sector-এ কাজ করি, BRAC বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ NGO-তে। ঘুরতে পছন্দ করি ও মানুষের সঙ্গ পছন্দ করি। রান্না করা ও মানুষকে খাওয়ানো আমার বিশেষ শখ। আমার বিশেষ ইচ্ছে অনুন্নত জায়গা গুলোতে ঘুরে ঘুরে কাজ করা।

বইমেলার চিঠি

প্রিয় বাতায়ন,

আজ ১১ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৮, বইমেলার শেষদিন। যখন এ চিটি লিখতে বসেছি তখনও কোলকাতার আকাশ বাতাস ভরে আছে নতুন বইয়ের গন্ধে, গল্প-উপন্যাস-কবিতা-স্মৃতিকথা – আলোচনার সৌরভে মাতোয়ারা বাংলার সংস্কৃতিজগত। সাহিত্যিক, প্রকাশক, পাঠক, সবার উপস্থিতি, আগ্রহ আর উন্মাদনার নিরিখে কোলকাতা বইমেলা সত্যিই অন্যন্য।

প্রিয় বাতায়ন, তুমি চেয়েছিলে বইমেলার গল্প শুনতে, কিন্তু আমার বইমেলা শুরুই যে হল বইমেলার ঠিক বাইরের এক কাফেতে। মেলার প্রথম দিনেই (৩১শে জানুয়ারি), বাতায়নের পক্ষ থেকে আমি, অনুশ্রীদি আর দাদা (তীর্থঙ্কর ব্যানার্জী) দেখা করলাম, বাংলায় এইসময়ের অন্যতম সেরা সাহিত্যিক যশোধরা রায়চৌধুরীর সঙ্গে। তখনো জানতাম না, বইমেলায় আগামী কয়েকদিন ওনার নামটা নিয়েই সবচেয়ে বেশি আলোচনা হবে। অনুশ্রীদি আর যশোধরাদি, দুই বড় মনের মানুষ কিছুক্ষণের মধ্যেই কোন জাদুমন্ত্রে যেন পরস্পরের আপনজন হয়ে গেলেন। আমি মুগ্ধ দর্শক হয়ে বসে রইলাম। শুধু মুগ্ধ বললে ভুল হবে, 'বিগ্ধ'ও বটে। বুঝিয়ে বলি, নারী ও অন্যান্য দুস্থ মানুষদের জন্য কাজ করা সংগঠনগুলির সঙ্গে যশোধরাদির জড়িয়ে থাকা, সময় দেওয়া নিয়ে আমি অনুশ্রীদিকে আগেই কিছু জানিয়ে ছিলাম। সেটা বুঝে প্রথমেই যশোদি ''মানস, একটু বাড়িয়ে বলেছে'' এই অভিযোগে আমায় বিদ্ধ করেছিলেন। বাতায়নের কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেয়ে উনি খুব উৎসাহ দিলেন। আমাদের মনেও থেকে গেল এক খোলা মনের কবির সঙ্গে এই আলাপ আর মতবিনিময়ের সুখস্মৃতিটুকু।

এখান থেকে বেরিয়েই সোজা বইমেলায়। দেখে একটু হতাশ হলাম। এখনো প্রকাশকরা স্টল গুছিয়ে উঠতে পারেননি। তারই মধ্যে কিছু বইপাগল অবশ্য হানা দিয়েছেন মেলায়।

এবারে ১২ দিনের বইমেলায় ছিলাম অনেকটা সময়, কিন্তু সে তুলনায় ঘুরে দেখার সুযোগ পেয়েছি খুব কম। বারবার কোনো না কোনো পাঠকের ডাকে চলে আসতে হচ্ছিল অভিযানের স্টলের সামনে। তাদের বইয়ে লিখে দিচ্ছিলাম শুভেচ্ছাবার্তা। এরই মধ্যে একসময় দেখি, অভিযানের স্টলে বসে আছেন, জয় গোস্বামী। সাড়ে তিন বছর আগে, আমার

প্রথম কবিতার বই পড়ে তাঁর শিষ্যাকে দিয়ে কবি আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। জয়-কবির সঙ্গে আমার সেই প্রথম দেখা, জীবনের একটা বিশেষ আভিজ্ঞতা। সেদিন আমার ট্রেনচালকের পেশার কথা শুনে চমকে উঠেছিলেন। আজ আবার সেটা উল্লেখ করতেই সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলেন। নতুন বইটা হাতে দিয়ে একটা প্রণাম করলাম। অগ্রজের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাপ্রকাশ হয়তো ওনার কাছেই শেখা।

খ্যাতি আর প্রতিষ্ঠার মধ্যগগনে দাঁড়িয়ে, এক প্রকাশ্য সভায় ওনাকে বলতে শুনেছিলাম, কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য, অগ্রজ শঙ্খ ঘোষের কাছে উনি কতটা কৃতজ্ঞ।

বাইরে দেখি খুব ভীড়, মাঝখানে পল্লব কীর্তনিয়া, কাব্যোপন্যাস লিখেছেন, জয়কে উৎসর্গ করেছেন। ওনাকে দিয়েই আবরণ উন্মোচন হবে। ছেলেটিকে খুব ভাল লাগে। ডাক্তারি ছেড়ে গান, সমাজসেবা (খুব উল্লেখযোগ্য কাজ করছেন), কবিতা লেখা, সব মিলিয়ে বেশ একটু সমীহ জাগায় মনে। হালকা আলাপ ছিলই, আরেকটু উৎসাহ দিয়ে এলাম।

কানে গেল, ওই যে আনন্দ ! সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন, কার আনন্দ ? কিসের আনন্দ ! আমি কি করুম ? এত লাইনে দাঁড়াতে পারুম না। ঘুরে দেখি একটি অল্পবয়সী মেয়ে তার বাবার সঙ্গে এসেছে মেলায়। পাশেই আনন্দ পাবলিশার্স-এর স্টল, বাইরে লম্বা লাইন।

বইমেলায় সারাদিন নানা টুকরো টুকরো সংলাপ ভেসে আসতে থাকে কানে। খুব উপভোগ্য আর মজার সব কথা। অনেক সংলাপে তো লুকিয়ে আছে, আস্ত ছোট গল্পের আভাস। সুযোগ পেলে আরেকদিন লেখা যাবে তা নিয়ে।

আলাপ হল বৃক্ষমানুষ কবি কমল চক্রবর্তীর সঙ্গে। নিজেই একটা প্রতিষ্ঠান, অথচ কি বিনয় ! কবিরা কি এইরকমই হয় ? আমন্ত্রণ জানালেন ভালোপাহাড়ে বেড়াতে যাবার।

বেশি ঘুরতে না পারলেও রোজ নিয়ম করে লিটিল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়নে একবার যাই। সবার সঙ্গে মতাদর্শে না মিললেও এদের সাহিত্যপ্রচেষ্টা, সাহিত্যপ্রেমকে আমি সম্মান করি। দুশো'রও বেশি লিটিল ম্যাগাজিনের স্টলে প্রায়ই কিছু পরিচিত মুখ পাই। মনে হয় এসে পড়েছি নিকটাত্মীয়দের মধ্যে। নানা ম্যাগাজিনে ভরে ওঠে ঝুলি। এক পূর্বপরিচিত ছাড়া, কাউকেই বলি নি আমার নতুন বইয়ের খবর। তারই মধ্যে আকর্ষণীয় চেহারার এক কবিদম্পতি দেখছি গল্প জুড়েছেন এক বৃদ্ধ লিটিল ম্যাগাজিন কর্মীর সাথে। তাঁর (বৃদ্ধটির) বইয়ের মলাট বা পাতার গুণমান নিয়ে একটু খুঁতখুঁতে ভাব। বৃদ্ধটি বললেন, রিটায়ার্ড লোক ভাই, এই পত্রিকাই কোনরকমে ছাপাই। আর দামী প্রকাশককে দিয়ে যে নিজের কবিতা বার করব সে পয়সা কোথায় ? আমার গলার কাছে কি যেন একটা দলা পাকিয়ে রইল। ভদ্রলোককে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, বাসে ট্রেনে চড়ে রোজকার বইমেলা হাজিরাই তার পক্ষে আর্থিক ও শারীরিক দিক দিয়ে বেশ অসুবিধার। মনে মনেই প্রণাম জানালাম তাঁর নিষ্ঠাকে। হে প্রবাসী, আমি সামান্য কলমচি, সাহিত্যপ্রেমের কোন ঐশ্বর্যে যে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে তাঁর পার্থিব দারিদ্র্য, আপনাকে বোঝাব সে সাধ্য আমার নেই। এ বোধহয় খালি এই বাংলাতেই সম্ভব !

আমার স্কুলতুতো দুই দাদা কবি সত্যপ্রিয় মুখোপাধ্যায় আর পল্লব বরণ পাল, এদের বই কিনলাম। সত্যপ্রিয়দার সঙ্গে অনেকটা ভাল সময় কাটালাম 'শব্দহরিনে'র স্টলে। ওদিক থেকে ফেরার সময় দেখি মাঠের মধ্যে আইসক্রিম এর গাড়ির মত, কি ওটা ? কাছে গিয়ে দেখি বেশ সুন্দর করে সাজানো 'ভাষানগরে'র অভিনব চলমান বইয়ের দোকান। পাশেই ভক্ত পরিবৃত হয়ে বসে আছেন কবি সুবোধ সরকার। ভীড় একটু কমতে শুভেচ্ছা বিনিময় হল।

ওহ দেখেছ ! প্রিয় বাতায়ন, নতুন বইয়ের সবুজ উঠোনে মাঝে মাঝেই ঠিকরে পড়ছে নক্ষত্রের আলো, আর তাতেই আত্মহারা আমি এতক্ষণ ধরে ভুলেই যাচ্ছি দরকারি তথ্যগুলো বলতে। যেমন, এই ৪২তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা এবারের থিম ছিল, ফ্রান্স। মেলার প্রায় মাঝামাঝি ফ্রান্সের দৃষ্টিনন্দন প্যাভিলিয়নে বাঙালী কবিদের আনাগোনা ছিল বেশী। এছাড়া পেরু, চিলি, মেক্সিকো, ব্রিটেন, স্পেন, আরও নানা ছোট বড় দেশের স্টল ছিল বইমেলা। তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় দেখতে হয়েছিল রাজবাড়ির আদলে বাংলাদেশের স্টলটি।

যেমন বলা হয়নি, এবারের মেলার থ্রিলারের ওপরই যেন নবীন পাঠকদের আগ্রহ খুব বেশি । তারই মধ্যে শ্রীজাত'র 'ধ্বংস' আর যশোধরাদির 'শ্রী শ্রী অন্নপূর্ণা ভান্ডারের চাহিদা ছিল দেখবার মত ।

এর মধ্যেই ৫/২ তারিখ সোমবার একটা কান্ড ঘটল । অনুজ কবি যশোধরা রায়চৌধুরীর কবিতা নিয়ে জয় গোস্বামীর বই, 'কবিতা : যশোধরা' প্রকাশিত হল । যশোধরা সম্মানিত বোধ করলেন, আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন । আর জয় তাঁর ঋষিতুল্য ঔদাসীন্যে অটল থাকলেও তাঁর এই ব্যতিক্রমী পদক্ষেপকে বাংলার সাহিত্যপ্রেমীরা উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ জানাল । যশোগাথার জয় – গানে আবেগে উদ্বেল হল দুই কবির অনুরাগী পাঠকরাও । আমার মনে হল যশোধরাদিকেই এই সম্মান ঠিক মানায়, কারণ দীর্ঘদিন থেকে উনিও নবীন কবিদের অসাধারণ সব কবিতা সবার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেন ।

এই বইমেলার ডায়রি'তে আমার দেখা কয়েকটি স্বল্পখ্যাত কিন্তু ভীষণ শক্তিশালী কলমের কথা না বললেই নয়, যেমন ঋজুরেখ চক্রবর্তী, শুদ্ধসত্ব ঘোষ, সায়ন্তনী নাগ বা শমীক ঘোষ । স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এরা প্রত্যেকে উজ্জ্বল এবং এতটাই আলোচনার দাবি রাখেন যে এই অল্প পরিসরে এনাদের কথা আর বিশদে লেখা গেলোনা ।

এই কদিনের অভিজ্ঞতায় মন ভরে গিয়েছিল । জানতাম না তখনও এমন একটা আনন্দ অপেক্ষা করে আছে আমার জন্য ।

টীম বাতায়নের পূর্বপরিকল্পনামত বৃহস্পতিবার বারবেলায় সিগনেট প্রেসে দেখা হল, শ্রীজাত আর দূর্বা'র সঙ্গে । অনুশ্রীদির সঙ্গে তো দেখলাম প্রায় পারিবারিক সম্পর্ক । শ্রীজাত আমাকেও চট করে আপন করে নিলেন । পর্বতের সামনে আমি সামান্য নুড়ি পাথর খুশিতে আপ্লুত হলাম । তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই কি করে যেন খবর ছড়িয়ে গেল । ভক্তরা এসে প্রায় ঘিরে ফেলল শ্রীজাতকে । আমরাও বিদায় নিলাম ।

তোমাকেও বিদায় বলার সময় হয়ে এল বন্ধু । অনেক বললাম, অনেক কথা বাকী রয়ে গেল । বইমেলা দেখাও যেমন শেষ হতে চায় না, তার গল্পও তেমনি অনিঃশেষ ।

প্রিয় বাতায়ন ভালো থেকো । আজ আসি ।

মানস ঘোষ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

স্মৃতিচারণ

জীবনের কবি যতীন্দ্রনাথ

শুক্লা সেন

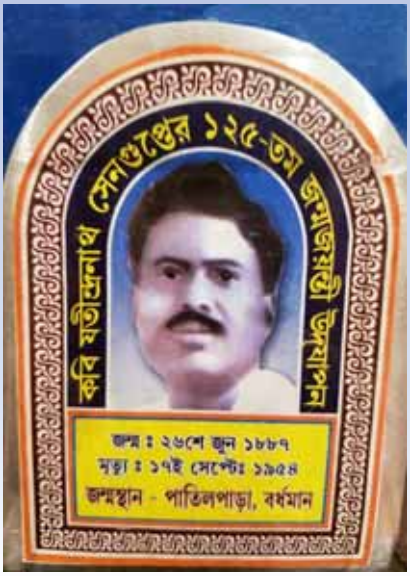

মরমী কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের জন্ম ২৬ শে জুন, ১৮৮৭ সালের বর্ধমান জেলার পাতিলপাড়া গ্রামে, তাঁর মাতুলালয়ের পৈতৃক নিবাস ছিল নদীয়া জেলার শান্তিপুরের অদূরে হরিপুর গ্রামে।

কবির শিক্ষা শুরু গ্রামের স্কুলে। পরে কলকাতায় Oriental Seminary থেকে Entrance পাশ করে পরে এফ.এ. পাশ করে শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়ে ১৯১১ সালে বি. ই. পাশ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর বিবাহ হয় শ্রীমতী জ্যোতির্লতা দেবীর সঙ্গে।

তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় নদীয়া জেলা বোর্ডে, পরে তিনি District Engineer পদে উন্নীত হন। পরবর্তী জীবনে বহরমপুরে কাশিমবাজার রাজ এস্টেট ইঞ্জিনিয়ার পদে যোগ দেন। ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

বহুজনেই তাঁকে দুঃখবাদী কবি আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে দুঃখবাদী ছিলেন না, দুঃখের বাস্তব রূপকে কবিতার মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন — তার নিদর্শন — তাঁর লেখা 'লোহার ব্যথা', 'ফেমিন রিলিফ' প্রভৃতি কবিতা। তাই তাঁর কাব্য কোন নৈরাশ্যক্লিষ্ট জীবনবিতৃষ্ণ মনের ক্রন্দন বা হতাশা নয়। তাঁর বলিষ্ঠ, বুদ্ধিশাসিত মন কোন প্রথাগত অধ্যাত্মচিন্তা বা ধর্মীয় সান্তনাকে স্বীকার করে নি। তাই তো ঈশ্বরের কাছে তাঁর তীব্র অভিমান ক্ষুব্দ অভিযোগ ''চেরাপুঞ্জি থেকে একখানা মেঘ ধার দিতে পারো গোবী সাহারার বুকে।' অথবা — ''প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশী রাতি।' তিনি খুবই প্রচার বিমূখ ছিলেন এবং ছিল সুদৃঢ় আত্মাভিমান যার ফলে তিনি কোন সারস্বত স্বীকৃতি পান নি।

অনেকে মনে করেন রবীন্দ্রোত্তর যুগের তিনি প্রধান রবীন্দ্রবিরোধী কবি। তাই যদি হবে তবে কেমন করে লিখলেন — ''২২শে শ্রাবণে'র মত কবিতা ?

''মরণের হাতের লীলা কমল তুমি / চলেছ আজ জনস্রোতের তরঙ্গে তরঙ্গে / সদ্যছেঁড়া সহস্রদল পদ্মের মতই ভেসে / শোকের বারদরিয়ায় / অগণিত নগননীয়ের নাগালের বাইরে।''

তাঁর রোম্যান্টিক অনুভূতিও যে কত কোমল ও গভীর ছিল তার পরিচয় পাই স্ত্রীর উদ্দেশ্যে রচিত ''মন্ত্রহীন'' কবিতায় —

''তোমারই তনুর ঝরণাধারায় / আজও সুশীতল আমার হিয়া / তারই গৌরবে গরবী সে আমি / তারই দানে ধনী করেছে যে সে / পলাশের ঝরা পলাশে যেমন / পলাশের তলা চৈত্র শেষে।''

ভাষাপ্রয়োগের স্বাতন্ত্র্যে, উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারের অভিনবত্বে এক অননুকরণীয় কবিসত্তার নাম যতীন্দ্রনাথ।

তাঁর রচিত ছয়টি কাব্যগ্রন্থ — মরীচিকা, মরুশিখা, মরুমায়া, ত্রিযামা, সায়ম্, নিশান্তিকা। এছাড়া শেক্সপীয়রের অনেক নাটকের অনুবাদ করেছিলেন।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পুত্রবধূ শুক্লা সেন পেশায় অধ্যাপিকা ছিলেন। ভিক্টোরিয়া কলেজের হেড অফ্ দি ডিপার্টমেন্ট। বেদ-এর উপর অনেক বই আছে।

স্মৃতিচারণ

জিষ্ণুর কবি যতীন

জিষ্ণু সেন

১২৫ বছরের নবীন কবি
তুমি বলে গেছ
'বাক্য উলটি নিলে
কাব্য আপনি মিলে'
তাই শোনাই তোমাকে নিয়ে
আমার একান্ত দুই একটি বাক্য ।

যৌবনে তুমি প্রেমকে করেছ অস্বীকার,
প্রোলেটারিয়েটের দিকে বাড়িয়েছ হাত বারম্বার,
স্তাবকতাও ছিল না তোমার অভিধানে ।
তাই তোমার পথে ফুলের দোকান
পড়েনি ২২শে শ্রাবণে ।

আমি জানি পঞ্চাশোর্ধেও
তুমি নাওনি মন্ত্র
ভগবানের বহু অবিচারকে করেছ তিরস্কার, বহুবার ।
এও জানি তুমি ফিরিয়ে দাওনি
এক বৃদ্ধ ডাবওয়ালাকে
তাও আবার শীতসন্ধ্যায় ।
মানুষের একনিষ্ঠ পুজারী
তোমাকে জানাই সেলাম ।

তবু
কেন তুমি লিখেছিলে
'এ জীবন নিষ্ফলে সফল'
বা
'মিথ্যে হইনু কবি, মিছে ইঞ্জিনিয়ার'
তবে তুমিও কি দেখেছিলে স্বপ্ন ?
তুমিও কি করতে আশা ?
তাই চুপি চুপি বলি শোনো
আসছে জন্মে
তোমার মত মনিষ্যির জন্য
খোলা আছে একটি রাস্তা
মহাকবির লেখনীতে আরও কিছু সোজা কথা ।

জিষ্ণু সেন – যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কনিষ্ঠ পৌত্র এবং সাহিত্য অনুরাগী । University of IOWA থেকে অর্থনীতিতে Doctorate । কবিতা লেখা আর নাটক করা প্রধান নেশা ।

রন্ধনপ্রণালী

বাঁধাকপি – কাহিনী

জয় মুখোপাধ্যায়

গতবছর পটোল পোস্ত আর পটোল-মিষ্টি শিখিয়ে দিয়েছিলাম। তার সঙ্গে একটা মজার গল্পও পরিবেশন করেছিলাম। সেই লেখাটা পড়ে, নানাজনের নানা অভিমত। কারো গল্পটা ভালো লেগেছিল, কারো রান্নাটা ভালো লেগেছিল, আবার কারো দুটোই। শ্রীমতি সুস্মিতা দত্ত সেই ভাবে পটোল-পোস্ত রান্না করে এনেছিল আমাদের বাড়ীর গানের আড্ডায়। সেই রান্না খেয়ে সবাই সাধুবাদ দিয়েছিল।

আমার বোনঝি, ''ফুটকি'', লেখাটা পড়ে বলল ''এটা তো একটা থ্রি-ইন-ওয়ান।'' আমার অবাক মুখ দেখে নিজেই বুঝিয়ে দিল, ''মানে একটা লেখার মধ্যে দুটো রান্না আর একটা গল্প।'' তিরিশ বছর আগে টু-ইন-ওয়ান খুব জনপ্রিয় ছিল। একই যন্ত্রের মধ্যে রেডিও আর ক্যাসেট-প্লেয়ার। সেই ক্যাসেট-প্লেয়ার উঠে গেছে অনেকদিন হল। এখন রেডিও কেউ শোনেন না, এফ এম ছাড়া, যেটা সবজায়গায় বাজে, অটোর মধ্যে, বাসের মধ্যে, সবার ই ফোনের মধ্যে। তাই টু-ইন-ওয়ান-এর হয়েছে অকাল-মরণ। আমারো একটা ছিল, সেই এক-কালের প্রিয় সঙ্গীকে স্মরণ করে, এখানে আনছি আর একটি থ্রি-ইন-ওয়ান। আমার স্ত্রী, দীপালি বলল বাঁধাকপি দিয়ে একটা ভাজা শেখাতে।

রান্নার উপকরণ গুলি বলছি ঃ

একটা বাঁধাকপি (বড় সাইজের), মাংসের কিমা (৫০০ গ্রাম), টম্যাটো (৫০০ গ্রাম) পেঁয়াজ (২৫০ গ্রাম), আদা (১০০ গ্রাম), রসুন (৭/৮ কোয়া), বেসন, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা, নুন, সরষে, লেবু বা তেতুলগোলা।

বাঁধাকপিটা যত বড় হয়, তত ভাল। বাঁধাকপি কেনার সময় দেখে নেবে যেন সবুজ আর বেশ ঠাস হয়। যে কপি সাদাটে, তার স্বাদ ভালো হয় না। আর একটু পুরনো হলে কিরকম যেন বাজে গন্ধ হয়। আমার দিদিভাই বলেছিল ''বাঁধাকপি পুরনো হলে মুলোর গন্ধ হয়।'' শুনে জামাইবাবু বলেছিল ''তুমি বলছ তাহলে বাঁধাকপি বুড়ো হলে মুলো হয়ে যায় ?'' আমাদের ছোটবেলায়, কোলকাতার পাড়ার ছোট ছেলেরা, সর্দার-জী ট্যাক্সি-ড্রাইভার গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছে দেখলে ''বাঁধাকপি, বাঁধাকপি'' বলে চেঁচাতো।

এখন বাঁধাকপিটা বেশ ভালো করে ধুয়ে নাও। সাবধানে, যেন ছিঁড়ে না যায়, একটা, একটা করে পাতাগুলো ছাড়িয়ে নাও। হ্যাঁ, ৮টা লাগবে। পাতাগুলো এবার প্রেসার-কুকারে বসিয়ে দাও। একটু নরম হলে নামিয়ে নিতে হবে।

সেদ্ধ করা মাংসের কিমা ভালো করে কষতে হবে। কড়ায় সাদা তেল গরম করে তাতে দাও পেঁয়াজ, আদা ও রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, নুন। এবার সেদ্ধ করা মাংস ওর মধ্যে দিয়ে বেশ খানিক নাড়াচাড়া করতে থাকো। কিমা হবে শুকনো, এটা পুর তৈরী হল।

ও হ্যাঁ, তুমি ভাবছ এখন আমি সর্দার-জীর গল্পটা শুরু করব, তাই তো ? গল্পটা সর্দার-জীর নয়, বাঁধাকপির। প্রায় বছর ১৫ আগে, আমি তখন ব্যাঙ্গালোরের এক কলেজে পড়াতাম। আমাদের ফাইনাল ইয়ারের বাইওলোজীর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গিয়েছিলাম র‍্যালিস এগ্রো-রিসার্চ ষ্টেশনে। সেখানে গবেষণার প্রধান বিষয় হল এগ্রিকালচারাল বাইও-টেকনোলজী। খুব ভালো ব্যবস্থা, আধুনিক যন্ত্রপাতি, সারি দিয়ে ল্যাবরেটরি। সেগুলির প্রতিটিতে এক-একেকটা বিশেষ তরকারীর ওপর গবেষণা চলে। আমরা গেলাম একটা ঘরে, সেখানে গবেষণা চলছে বেগুন নিয়ে, তার পরেরটি টম্যাটো, ইত্যাদি। প্রত্যেক ল্যাবরেটরিতে কিছু তরুণ-তরুণী সাদা এপ্রন পরে কাজ করছিল এবং উৎসাহভরে আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছিল তাদের কাজ। খানিক পরে আমরা পৌঁছলাম বাঁধাকপি-ল্যাবরেটরিতে। সেখানে এক অত্যুৎসাহী তরুণ আমাদের

বাঁধাকপি সম্বন্ধে লম্বা ভাষণ দিতে লাগল। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা তো সব মুগ্ধ। ভাষণ শেষ হলে তরুণ গবেষক জিজ্ঞেস করল আমাদের কোন প্রশ্ন আছে কিনা। একজন ছাত্রী ''অখিলা'' প্রশ্ন করল, ''আচ্ছা, এখানে চাকরী পেতে গেলে কত নম্বর পেতে হবে ?'' বাঁধাকপি গবেষক অতি বিরক্ত হয়ে উত্তর দিল, ''আমাকে শুধু বাঁধাকপি সম্বন্ধে প্রশ্ন কর। বাঁধাকপি ছাড়া আমি আর কিছু জানি না।'' সবাই জোরে হেসে উঠল। তখন আর এক ছাত্র ''সুরেশ'' ভালো-মানুষের মতো মুখ করে জিজ্ঞেস করল, ''টম্যাটো সম্বন্ধে প্রশ্ন করা চলবে ?'' আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে বাঁধাকপি গবেষক খুব রাগী মুখ করে ঘর থেকে গট-গট করে বেরিয়ে গেল। দেখ, এতক্ষণে কিমা তৈরী হয়ে গিয়েছে আর বাঁধাকপির পাতাগুলো নরম হয়ে এসেছে। এবার পাতার মধ্যে কিমার পুর দিয়ে, সেটা চারদিক থেকে ভাঁজ করে রাখ। এবার ওগুলো বেসনে ডুবিয়ে গরম তেলে এক-এক করে ভেজে তুলে, একটা বড় থালার ওপর টিস্যু কাগজ রেখে তার ওপর সাজিয়ে দাও। টিস্যু কাগজ বাড়তি তেলটা টেনে নেবে।

টম্যাটো সবগুলো তো লাগেনি, বাকি আছে যা তাই দিয়ে চটপটা চাটনি বানাতে হবে। টম্যাটোগুলো ভাপিয়ে নাও। মাইক্রোওয়েভে করতে পারো। একটু ঠান্ডা হলে, ছুরি দিয়ে সাবধানে কাট, এবার সহজেই খোসাটা ছাড়িয়ে নিতে পারবে। খাওয়ার সময় তাহলে আর মুখে খোসা লাগবে না। কড়ায় সাদা তেল দাও, বেশ গরম হলে, সরষে-ফোড়ন দাও। একটু ভাজা-ভাজা হলে, টম্যাটো সেদ্ধ দিয়ে নাড়াচাড়া কর। এবার দাও লঙ্কা গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা, নুন আর স্বাদ মতো লেবুর রস বা তেঁতুলগোলা। ভালো করে ফুটতে দাও। ৫ মিনিট পরে নামিয়ে নাও। একটু ঠান্ডা হোক।

ব্যাস, তৈরী হয়ে গেছে বাঁধাকপির কাটলেট আর টম্যাটোর চটপটা চাটনি। দুটো একসঙ্গে দারুণ জমেছে।

ও, হ্যাঁ, টম্যাটোর ব্যাপারটা বলা হয়নি। ওই যে টম্যাটোর গবেষণাগারে যে তরুণীটি ছিল, তার সঙ্গে বাঁধাকপি গবেষকের একটু ইয়ে ছিল আর কি। সেটা ''সুরেশ'' আগে থেকে জানতো, তাই জিজ্ঞেস করেছিল, ''টম্যাটো সম্বন্ধে প্রশ্ন করা চলবে ?''

এখন তুমি আবার বাঁধাকপি সম্বন্ধে আমায় কি প্রশ্ন করছ ? কয়েকটা পাতা দিয়ে রান্না হল, এখন বাকী বাঁধাকপি দিয়ে কি হবে ? বাকীটা তুমি পরে রান্না করে নিও। সে সব রান্না তো তুমি জানো। বাঁধাকপি কুঁচিয়ে, আলু, টম্যাটো দিয়ে রোজকার তরকারি। যদি, কড়াইশুঁটি দাও স্বাদ বাড়বে। আর যদি আমিষ রান্না করতে চাও, তাহলে, কুচো চিংড়ি-ভাজা বা রুই মাছের মাথা কড়া করে ভেজে ভেঙে দিও, দারুণ লাগবে।

তোমার হাসি দেখে ঠিক বুঝতে পারছি না কেন হাসছ — গল্পটা শুনে না নতুন রান্না খেয়ে। বাঁধাকপি সম্বন্ধে আবার প্রশ্ন ? এই রান্নাটার নাম কি ? সে তুমি তোমার পছন্দ মতো একটা নাম দিয়ে দাও। শেক্সপীয়ার তো বলেই গেছেন, ''সুস্বাদু রান্নাকে যে নামেই ডাক, তাতে কি তার স্বাদ বদলায় ?''

Dr Joy Mukhopadhyay lives in Bangalore. He holds a Masters Degree from IIT Kharagpur and a PhD from IISc, Bangalore. He worked in Industry and Academics and presently a Visiting Professor at different Institutes in Bangalore and other places in India. He takes a deep interest in Arts and Literature and Dabbles with creative writing in Bengali and English.

ভ্রমণ

পুজোর ছুটিতে

মঞ্জিষ্ঠা রায়

এবার পুজোর ছুটিতে ঠিক হলো মধ্যপ্রদেশ যাওয়া হবে, কিন্তু কটা দিনের ছুটিতে পুরো মধ্যপ্রদেশ দেখা সম্ভব না, তাই আমরা বেছে নিলাম চারটি জায়গা — ১) খাজুরাহো, ২) কাঁনহার জঙ্গল, ৩) বান্ধবগড় জঙ্গল, ৪) জব্বলপুর।

মহাসপ্তমীর দিন সন্ধ্যায় আমাদের ট্রেন, একটু যে মন খারাপ হচ্ছে না তা নয়, প্যান্ডেলে মা-এর মূর্তি, ঢাক-এর আওয়াজ, ধুপ ধুনোর গন্ধ, আলোয় আলোয় নতুন করে সেজে উঠেছে শহর, এই সব পিছনে ফেলে এগিয়ে চললাম হাওড়া স্টেশন। শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস-এ করে রওনা দিলাম সাতনা-র উদ্দেশ্যে। যতবারই দূরপাল্লার ট্রেন-এ চাপি ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যায়, সেই একই রকম ভাবে চা'ওয়ালাদের 'চায়ে চায়ে', ট্রেন-এর কু ঝিক ঝিক শব্দ আর দুলুনি। রাতের অন্ধকারে বাইরেটা কিছুই দেখা যায় না, তাই রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লাম। সকাল-এ উঠে দেখি বাইরের দৃশ্য অনেক বদলে গেছে, মালভুমি, রং বেরং-এর পাথুরে মাটি, নীল আকাশ মাঝে মাঝে ছোট বড় নদীর ওপর ব্রিজ পেরিয়ে এগিয়ে চলেছে আমাদের কুউ ঝিক ঝিক। সাতনা পৌঁছালাম যখন প্রায় বেলা বারোটা, এখন থেকে গাড়িতে খাজুরাহো প্রায় ১২০ কিলোমিটার। খাজুরাহো যাবার রাস্তা প্রচন্ড খারাপ, রাস্তার দুধারে ধুধু হলুদ ক্ষেত, জলের অভাবে চাষ বাস কিচ্ছু হয় নি। এবছর নাকি প্রচুর চাষি নিজেদের ক্ষেত-এ আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, মানুষ জনও খুব কম, রাস্তার ধারে মাঝে মাঝে ময়ূর দেখা যাচ্ছে, আর রয়েছে প্রচুর গরু ও বলদ যারা সারিবদ্ধ ভাবে রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটছে বা বসে আছে — বলা বাহুল্য বার বার এদের গাড়ির সামনে থেকে সরানো এক দুঃসাধ্য কাজ, তবু এভাবে সব প্রতিকূলতা কাটিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম। খাজুরাহোর হোটেলে যখন এসে পৌঁছালাম তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

পরদিন সকাল এ ব্রেকফাস্ট সেরে রওনা হলাম রানে জলপ্রপাত। খাজুরাহো থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে লাল গোলাপি ধূসর বিভিন্ন রংয়ের বিশুদ্ধ ক্রিস্টাল গ্রানাইট দিয়ে নির্মিত ৩০ ফুট গভীর এই প্রাকৃতিক জলপ্রপাতটি। ছোট ছোট সংখ্যা ফলস নিয়ে গড়ে ওঠা এই ফলসটি নায়াগ্রার ভারতীয় সংস্করণ নামে চিহ্নিত। চারদিকে সবুজ জঙ্গল তার মাঝখান দিয়ে পথ চলে গেছে জলপ্রপাত-এ যাবার জন্য। পুর্ববর্তী কিছু এক্সিডেন্টের জন্য পুরো জায়গাটা রেলিং দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। ওপরে নীল আকাশ, সূর্যের আলোয় জলপ্রপাতের জল চিকমিক করছে, অনবরত দানবের মতো শব্দ করে বয়ে চলেছে — প্রকৃতির অপরূপ, অকৃত্রিম সৃষ্টি। বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম আমাদের পরবর্তী গন্তব্য — খাজুরাহোর মন্দির। চান্দোলাবংশের ধর্মীয় রাজধানী বলে পরিচিত এই মন্দির নগরী। সুরক্ষার জন্য চারিধারে দেয়াল পরিবেষ্টিত ছিল এবং নগরে প্রবেশ বা নির্গমের জন্য ৮টি তোরণদ্বার ব্যবহার করা হত। কথিত আছে প্রতিটি তোরণদ্বারের দুপাশে দুটি করে খেজুর গাছ লাগানো ছিল তাই খেজুর গাছ থেকেই শহরের নাম হয় 'খাজুরাহো', এই মন্দিরগুলি ইনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকার অন্তভুক্ত — ভারতীয়দের কাছে যা গর্বের বিয়ষ। খাজুরাহো ভারতের একটি ছোট্ট গ্রাম কিন্তু গ্রামটি সারা বিশ্বে বিখ্যাত কিছু মূর্তির জন্য। মন্দির ও মূর্তিগুলো প্রায় ১০০০ বছরের পুরোনো। খাজুরাহোর

মন্দির গুলোকে মূলত ওয়েস্টার্ন, ইস্টার্ন ও সার্দান – এই তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, চান্দেলা বংশের রাজারা ১০০ বছর ধরে মোট ৮৫টি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন যার মধ্যে অবশিষ্ট রয়েছে ২২টি । ইস্টার্ন ভাগের মন্দির গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বামন মন্দির, আদিনাথ, পার্শ্বনাথ, বরাহ মন্দির ইত্যাদি । গ্রামের মেঠো রাস্তা পেরিয়ে এসে পৌঁছলাম বামন মন্দির-এ । বেলেপাথরের তৈরী অপূর্ব সুন্দর বেইজ রং-এর মন্দির যার দেয়ালে খোদাই করা রয়েছে রণসাজে সেনাদল, যুদ্ধসাজে শিকারি, হাতি-ঘোড়া-উট, নৃত্যরত অপ্সরা ও দেবদেবীর মূর্তি । মন্দির-এর ভিতর ভগ্নপ্রায় শিব, বিষ্ণুর মূর্তি, এই মন্দিরগুলিতে কোনো দেব-দেবতারই পূজা হয় না । মন্দিরের কারুকার্য ও কিছু ছবি তোলার পর আমরা চললাম পশ্চিমের ভাগের মন্দির গুলো দর্শন করতে । কান্ডারীয় মহাদেব, লক্ষণ, বিশ্বনাথ, চিত্রগুপ্ত, দেবী জগদম্বা সহ ১২টি মন্দির নিয়ে সবুজ বাগিচায় ঘেরা এই মন্দির নিয়ে সবুজ বাগিচায় ঘেরা এই মন্দিরাজি । এখানে মূল আকর্ষণ কান্ডারীয় মহাদেব মন্দির । ৩১ মিটার উঁচু এই মন্দিরটি খাজুরাহের বৃহত্তম আর উচ্চতম মন্দির । প্রতিটি মন্দির-এর যেমন গল্প রয়েছে তেমন মন্দিরের গায়ে খোদাই করা মূর্তি গুলোরও গল্প রয়েছে । বরাহ মন্দির-এ ৮ ফুট লম্বা আর ৬ ফুঁট উঁচু বরাহ মূর্তির গায়ে ৬২৭ হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি খোদাই আছে । মানুষের জীবন, দৈনন্দিন চাহিদা, নারী-পুরুষের সৃষ্টি রহস্যের মূলে মৈথুন, সে যুগের যা কিছু যুদ্ধ, বিবাহ থেকে শুরু করে জীবনযাপনের অনুষঙ্গ সব কিছু নিয়ে ভাস্কররা তৈরী করেছিল মন্দিরের দেওয়াল, মন্ডপ, তোরণ । গাইডের মুখে গল্প শুনতে শুনতে কখন যেন একাত্ম হয়ে পড়েছিলাম ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা মন্দিরগুলোর সাথে । চোখের সামনে যেন ছায়াছবির মত ভেসে যেতে লাগলো চান্দেলা বংশের ইতিহাস । এরই মধ্যে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এলো । শুনলাম ''লাইট এন্ড সাউন্ড'' শো সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় । মধ্যপ্রদেশ ট্যুরিজম আয়োজিত হিন্দী ও ইংরেজীতে ধারাভাষ্যে একঘন্টা ধরে সেই প্রদর্শনী ওয়েষ্টার্ণ গ্রুপ অফ টেম্পলসের প্রকান্ড মাঠে । টিকিট কেটে চেয়ারে বসলাম, ঘুটঘুটে অন্ধকার । আকাশে একফালি চাঁদ আর কয়েকটি তারা টিম টিম করে জ্বলছে । ভাষ্যপাঠের শুরু, রঙীন ও কৃত্রিম আলোয় ফুটে উঠলো স্বর্গের অপ্সরা, উর্ব্বশী রম্ভা, কিন্নর-কিন্নরী । অবাক হয়ে ভাবলাম কত বছর ধরে না জানি ছেনি-হাতুড়ি-বাটালির শব্দের তুফানে মুখর হয়েছিল খাজুরাহের আকাশ বাতাস । ভাস্করের মনমন্দিরের কল্পনাপ্রসূত হয়ে জন্ম নিয়েছিল এই অভিনব শিল্পকর্ম ।

পরদিন সকাল-এ বেরিয়ে পড়লাম বান্ধবগড় । খাজুরাহো থেকে বান্ধবগড় যেতে গাড়িতে সময় লাগলো প্রায় ৬ ঘন্টা । এদিকে রাস্তা অনেকটা ভালো, মাঝে পথে দেখলাম পান্ডব গুহা । একটা ছোট পাহাড়ের গায়ে পাঁচটা গুহা আছে তার স্থানীয় লোকেদের ধারণা অনুযায়ী মহাভারতের পঞ্চপান্ডবরা বনবাসের সময়ে এখানে কিছুদিন ছিলেন । অনেকগুলো সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গুহার কাছে পৌঁছানো যায় । চুনা পাথরের পাহাড়ের গা দিয়ে সরু হয়ে ঝর্ণার মতো জল পড়ছে সেই জল নাকি অমৃত, অব্যর্থ ওষুধ তাই অনেক মানুষ দেখলাম পরম যত্নে সেই জল সংগ্রহ করছেন । সামনে বিরাট একটি জলাশয়, শান্ত শীতল এই জায়গাটিতে আগে হরিণ-এর দল জলপান করতে আসতো আর এখানকার রাজা মহারাজারা তখন এই সামনেই গা ঢাকা দিয়ে চুপিসারে শিকার করতেন । চারিপাশে উঁচু উঁচু গাছের সারি আর গাছের সারি আর গাছের ওপর-এ মৌমাছির চাক । বেশ খানিক্ষণ এখানে কাটিয়ে আবার রওনা দিলাম । ভারতের যে কয়েকটা রাজ্যে দেখার মতো জঙ্গল এখনও রয়েছে, তাদের মধ্যে অন্যতম মধ্যপ্রদেশ । কানহা, বান্ধবগড়, পেচ, পান্না ইত্যাদি । পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ার্সের জঙ্গলে এক দু'বার আগে গেছি । সেভাবে বলতে গেলে জঙ্গল সাফারি আগে কখনো করিনি তাই বান্ধবগড়-এর জঙ্গল নিয়ে অদ্ভুত এক আকর্ষণ কাজ করছিলো । ধু ধু ফাঁকা রাস্তা গাড়ি ঘোড়া কিছুই নেই দুধারে সারি দেয়া গাছ আর দূরে ছোট ছোট পাহাড় আর টিলা উঁচু নিচু রাস্তা পেরিয়ে এগিয়ে চললাম, বান্ধবগর পৌঁছালাম যখন বিকেল হয়ে গেছে । জঙ্গলের ধারে রিসোর্ট । চারিদিক শান্ত শুধু ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ, রাতের অন্ধকার-এ মনের সুখে জোনাকি-র দল নেচে বেড়াচ্ছে । আমাদের ঘরটিও বিশাল বড়, উঁচু সেগুন কাঠের পালঙ্ক আরও নানান পুরোনো আসবাবে সাজানো, জঙ্গলের মাঝখানে এরকম পরিবেশ-এ বেশ একটা গা

ছম ছম ভাব। রাতের খাবার খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। ঘর অন্ধকার করতেই দেখলাম কয়েকটা জোনাকি সারা ঘরে উড়ে বেড়াচ্ছে। আমার ছয় বছরের ছোট্ট ছেলে – বাবো, জোনাকি পোকার গল্প শুনলেও চোখে দেখেনি, তাই অবাক হয়ে দেখলো, দুহাতের মধ্যে আলতো করে একটা জোনাকি ধরে ছেলের হাতে দিলাম, বহু দামি খেলনা পেলেও এমন আনন্দ ওর মুখে আগে দেখিনি। উপলব্ধি করলাম প্রকৃতি আর আমাদের সম্পর্কটা চিরন্তন। সকালে উঠেই জঙ্গল সাফারি। মধ্যপ্রদেশ আসার আগে মনস্থির করে এসেছিলাম যে জঙ্গল-এ গেলেই যে বাঘ মহাশয়-এর দেখা মিলবে আশা করবো না। বাঘ দেখি না দেখি হতাশ হবো না – এই মন্ত্রে নিজেকে দীক্ষিত করলাম।

পরদিন সকাল সাড়ে পাঁচটায় জিপ এসে হাজির হলো। একটি জিপ-এ সেন্টার পয়েন্ট অবধি গিয়ে আবার একটি অন্য জিপ-এ করে জঙ্গল ঘুরে দেখতে হয়। বর্ষার পর আজই জঙ্গল খুলছে, বর্ষার সময় এখানকার সব জঙ্গল গুলি ২ মাসের জন্য বন্ধ থাকে। বাইরে বেশ ঠান্ডা অল্প কুয়াশা, জিপ ছুটে চলেছে বান্ধবগড় ফরেস্ট-এর গেট-এর দিকে, চারদিকে প্রচুর নাম না জানা পাখির ডাক আর সবুজ চারিপাশ। কিছুক্ষণ পর-এ পৌঁছে গেলাম টালার গেট, প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র পরীক্ষার পর ঢুকে পড়লাম প্রকৃতির এই মেহেফিল-এ, সঙ্গী গাইড সাহেব এ জঙ্গল-এর সকল ঠিকুজি কুষ্টি দিতে শুরু করলেন আর আমাদের জিপসিও এগিয়ে চলতে লাগলো জঙ্গলের গভীরে। চারিপাশের সদ্য ফোটা কাশফুল গুলি প্রমাণ দিচ্ছে বর্ষা শেষ হয়েছে। ছড়িয়ে থাকা প্রান্তর, শাল পিয়ালের বন, অনুচ্চ টিলা, তির তিরে বয়ে যাওয়া নালা আর বর্ষার জলে সদ্য স্নানসেরে ওঠা যুবতী অরণ্যের রূপ লাবণ্যকে দুচোখ মেলে দেখছি এমন সময়েই হঠাৎ করে সামনে দিয়ে চলে গেলো একজোড়া ময়ূর ময়ূরী। একটা জিপ যাবার মতোই সরু রাস্তা, ২ মাস বন্ধ থাকার ফলে মাটির রাস্তায় ঘাসের কার্পেট বিছিয়ে গেছে, কাঁটা তার বা সাইন বোর্ড সবেতেই সবুজের ছোঁয়া। প্রকৃতি নিজের মতন করে সেজে উঠেছে। মাঝে মাঝে পথের বাঁকে গাড়ি থামিয়ে গাইড আমাদের পাখি দেখাচ্ছেন আর জঙ্গলের গল্প বলে চলেছেন। আশপাশে যত গাছ রয়েছে তাদের সবার গায়েই গয়নার মতো চিকচিক করছে রুপোলি জাল আর ঠিক তার মাঝে রয়েছে একটি বিরাট আকার মাকড়শা, এতো বড়ো কালো মাকড়শা আমি আগে কখনো দেখিনি। গাইড সাহেব বললেন এ হলো জায়ান্ট উড স্পাইডার, ওই বিশাল আকার স্পাইডার হলো একটি মহিলা মাকড়শা আর জালের এক কোণ-এ বসে রয়েছে একটি পুরুষ মাকড়শা, বিবাহবন্ধনে লিপ্ত হবার পর শরীর ডিম পাড়ার শক্তির জন্য মহিলাটি পুরুষ মাকড়শাটিকে খেয়ে নেয়। কি আজব আমাদের এই প্রকৃতি। ভালোবাসায় প্রাণ বিসর্জণ দেয়া বোধহয় একেই বলে। জানলাম ৬-৭ ফুট-এর গাছ-এ প্রায় ৯-১০ রকম এর বিভিন্ন প্রজাতির মাকড়শা থাকে, যারা নাকি এই জঙ্গল বাঁচায়, রক্ষা করে, কিভাবে ? গাছের পাতা খাবার অজস্র পোকা ও শুয়োপোকাও রয়েছে জঙ্গলে, তাদের উৎপাতে হয়তো এতদিনে গাছের সব পাতা শেষ হয়ে যেত তাই এই মাকড়শার জালগুলি গাছগুলোকে আগলে রেখেছে। এরকম জঙ্গল-এর আরো টুকরো টুকরো কথা শুনতে শুনতে গাড়ি এগিয়ে চললো পরের সাইট পয়েন্ট-এ। একটি বিশাল আকার জলাশয়, ওপারে একটি ছোট পাহাড় আর নিচে গাছপালার ঝোপ সেখানেই দেখা গেলো একপাল হরিণ। ছোট বড়ো নানা মাপের হরিণ মনের সুখে জল খেয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, আমাদের জিপ-এর আওয়াজে তাদের সামান্য একটু ছন্দপতন ঘটালো, যে যার খাওয়া থামিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে একদৃষ্টে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলো খানিকক্ষণ, তারপর কোনো ক্ষতির সম্ভবনা না দেখে আবার নিজেদের কাজ-এ ফিরে গেলো। এখান থেকে কিছুটা এগিয়ে নরম মাটিতে কারো এক পায়ের ছাপ দেখে গাড়ি থামলো, গাইড সাহেব বললেন এটি একটি ব্ল্যাক প্যান্থার-এর পায়ের ছাপ, আজ ভোরে প্যান্থার আসেপাশে কোথাও দেখতে পেলাম না তাই পায়ের ছাপ দেখেই মন ভরালাম। বন দফতরের অনুমতি নিয়ে ঘুরে আসা যায় বান্ধবগড় দুর্গ। রাজপরিবারের অনেক ইতিহাস যুক্ত হয়ে আছে এর সাথে। ধ্বংস হয়ে যাওয়া পিলার বা দেওয়ালে কান পাতলে ইতিহাস কথা বলে যায়, মহারাজা মার্তন্ড সিং এই বনেই খুঁজে পান এক অনাথ বাঘ শাবককে। যার গায়ের রঙ সাদা। তাকে বড় করা হয় দুর্গে রেখে

তার নাম দেওয়া হয় মোহন। ''নাহ জঙ্গল-এ কোনো মুভমেন্ট নেই '' — বলে উঠলেন গাইড সাহেব। জঙ্গল এখন খুব শান্ত, হয়তে পাহাড়ের ওপারে বাঘমামারা বিশ্রাম করছেন, বর্ষা কালে পাহাড়ের উপরেও জল পাওয়া যায় তাই আর কষ্ট করে নিচে এসে জলাশয়-এ জলপান-এর প্রয়োজন নেই। গাড়ি এগিয়ে চললো কিছু দূর যেতেই নীল গাই দেখলাম আর দেখলাম সাম্বার হরিণ আর বার্কিং হরিণ। মাঝে মাঝে ময়ূর ডেকে উঠেছে আরো কত যে পাখির গান, জঙ্গল-এর শান্ত সবুজ এই মাতৃরূপ যতই দেখি প্রাণ ভরে না।

জঙ্গল সাফারি শেষ করে আবার রিসোর্ট-এ ফিরে এলাম, দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে বিকালে এখানে গ্রাম-এ একটু ঘুরে এলাম। দুধারে সবুজ আর মাঝে পিচ ঢালা সরু রাস্তা, গাছে বাবুই পাখির বাসা, আলপনা দেয়া মাটির ছোট্ট ছোট্ট বাড়ি, বাড়ির সামনে ছেলে মেয়েরা খেলছে, দূরে একটি মেলা বসেছে, বহু দূর থেকে মানুষ খালি পায়ে হেঁটে মেলায় এসেছে, কাঁচের চুড়ি, রুপোলি নুপুর, ছোট ছোট খেলনা বিক্রি হচ্ছে। মেলার একাপাশে প্রকান্ড ঝুরিওলা বট গাছের তলায় এক বিশাল জটাধারী গেরুয়া বসন পরা সন্ন্যাসী তার ভক্তদের হাতে জড়িবুটি বেঁধে দিচ্ছেন, মানুষ সাষ্টাঙ্গে তাকে প্রণাম করছে, মাঝে মাঝে সুউচ্চ স্বরে বলে উঠছেন 'আলোকনিরঞ্জ'!! মহিলাদের সবারই মাথায় একগলা করে ঘোমটা তাদের শুধু উল্কি আঁকা, সবুজ কাঁচের চুড়ি পড়া হাত দেখা যায়, হয়তো এই মেলাই তাদের এক ও একমাত্র বিনোদন, এই একটা দিনই হয়তো সেজেগুজে ঘর থেকে তারা স্বামী ছেলেপুলে পরিবারের মানুষজনের সঙ্গে বাইরে বেরোন। এ যেন আজকের ভারতবর্ষের মাঝে এক পুরোনো ভারতবর্ষ।

কাল সকালে আমরা যাবো কানহা, মধ্যপ্রদেশের আরো এক জঙ্গল। সকাল সকাল বান্ধবগড়-কে টাটা করে বেরিয়ে পড়লাম কানহা জঙ্গলের উদ্দেশ্যে। ঝকঝকে সুন্দর সকাল ঢেউখেলানো পিচ ঢালা রাস্তা দিয়ে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলেছে। যেদিকেই চোখ যায় শুধু সবুজ আর সবুজ। পৌঁছতে প্রায় ৫ ঘন্টা সময় লাগলো কানহার নদী যখন পেরোলো তখন বিকেল, আকাশ কমলা হয়ে গিয়েছে আর নদীটিও যেন কমলা আলোয় চকচক করছে, আজকের মতো সারা গায়ে মেখে নিচ্ছে শেষ সূর্যের আলোটুকু আর নদীর দুপাশে গাছের সারি। অনেকের মতে কানহা জঙ্গলের নাম এই নদীর নাম থেকেই। রাস্তার দুধারে ঘরবাড়ি কম। কিছুদূর যেতেই আমাদের রিসোর্টের সাইন বোর্ড চোখে পড়লো।

৯৪০ বর্গ কিলোমিটারের কোর বা প্রধান এলাকা। তবে শুধু আয়তনেই শ্রেষ্ঠ নয়, সৌন্দর্যেও শ্রেষ্ঠ। বিনা কারণে কানহাকে কুইন অব দ্য উইলডারনেস বলা হয় না। এখানে টিভি চলে না মোবাইল চলে না এমনকি দিনের অনেকটা সময় বিদ্যুৎ পর্যন্ত থাকে না। আশ্চর্য এক নীরবতা। আমাদের সাফারি পরদিন বিকেলে। দুপুর ৩টে নাগাদ কিসলি গেটের সামনে জিপসির সারিতে আমরাও যোগ দিয়েছি। কাউন্টার থেকে ফর্ম ভর্তি করে টাকা জমা দিতে হয় তারপর সময় হলে গেট খোলে। রসিদ হাতে একজন গাইড গাড়িতে উঠলেন। কিসলি গেট খুলল। জিপসি ঢুকল কানহার কোর এলাকায়। ধীরে ধীরে লাইন করে একটার পর একটা জিপসি। ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম। বিশাল মাঠের মধ্যে দিয়ে গাড়ি চলেছে। দূরে যতদূর চোখ যায় সবুজ-এ-সবুজ আর ফিনফিনে সবুজ ঘাস তারই মাঝে মিশে রয়েছে এক দল চিতল হরিণ। বড়ো বড়ো ঝুরিওয়ালা গাছ-এর পাশ দিয়ে গাড়ি চলেছে, কখনো কখনো রাস্তায় ছোট ছোট ঝর্ণার মতো বয়ে গিয়েছে তার ওপর দিয়ে জল ছিটিয়ে জিপ ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে। বাঁ পাশে এক প্রকান্ড গাছের তলায় দেখা গেলো একটি শেয়াল, তীব্র দৃষ্টিতে আমাদের দিকে দেখছে, মুহূর্তের মধ্যে জঙ্গলে ঢুকে গেলো। গাড়ির আওয়াজ এ জঙ্গলে মানায় না, মনে হয় যেন কারো বাড়ি তাকে না বলে ঢুকে উৎপাত করছি। জিপ থামিয়ে গাইড দেখালেন এক দল গৌর। অনেকে একে ইন্ডিয়ান বাইসন বললেও আসলে গৌর হল গো প্রজাতির। কানহায় হাজারখানেক গৌর আছে বলে অনুমান। বিশালদেহী জীব, বাঘের গন্ধ পেলে ফোস ফোস করে আওয়াজ করে আর মাটিতে পা ঠোকে। তাই দেখে দলের সকলে সতর্ক হয়ে যায়। প্রাজ্ঞ প্রৌঢ়-এর মতন আমাদের সামনে চোখ গুলি তাদের বড়ো মায়াবী, সিং দুটি মুকুটের মতো বিরাজমান এর মধ্যে কিছু বাচ্চাও আছে যারা তাদের বাবা মার পিছু পিছু ঘুরছে। গাড়ি এগিয়ে চললো, দূরে একটি জলাশয় সেখানে জল খাচ্ছে এ জঙ্গলের বিখ্যাত বারাশিংহা। পৃথিবীর আর কোথাও এরা নেই। শুকনো জমিতে থাকে বলে নাম হার্ড গ্রাউন্ড বারাশিংহা। হরিণ প্রজাতির সদস্য বারাশিংহার নাম অনেকটাই আক্ষরিক। দু'দিক মিলিয়ে বারোটা শিং এদের মাথায় থাকবেই, অনেক সময় তার

বেশিও থাকে । সেই শিঙের বাহার তাকিয়ে দেখার মতো । ওদের পাকা গমের মতো বাদামি গায়ে রোদ পড়তে আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে । যেতে যেতে দেখছি গাছের ওপর থেকে লঙ্গুর কীভাবে পাতা খাওয়ার সময় কচি কচি ডালপালা নীচে ফেলছে আর চিতলের দল গাছের তলায় জড়ো হয়ে সেই পাতা খাচ্ছে । দুই প্রাণীর মধ্যে সম্পর্ক নিবিড় । খাবার সরবারহ করা ছাড়াও গাছের ওপর থেকে লঙ্গুরেরা নজর রাখে মাংসাশী প্রাণীদের ওপর । ওদের অ্যালার্ম কল শোনামাত্র চিতলেরা সতর্ক হয়ে যায়, বেগতিক দেখলে দৌড় দেয় । কানহার সব শেষ বাঘসুমারি অনুযায়ী বাঘের সংখ্যা ১২৮ । বাঁশঝাড়ের মধ্যে কিছু একটা আভাস পেয়ে জিপ দাঁড়িয়ে গেলো । নাহ বাঘ নয় একটি স্পটেড ডিয়ার । এছাড়াও আরো অনেক পাখি দেখলাম ব্ল্যাক হেডেড ওরিয়ল, জাঙ্গল ব্যাবলার, হোয়াইট নেকড স্টর্ক । ফেরার সময় হয়েছে । দূরে দেখলাম পড়ন্ত বিকেলের সোনালী আলোয় পাহাড়ের তলায় হরিণের পাল ঘাস খাচ্ছে, বিদেশি টেলিভিশানে এমন ছবি দেখেছি, কিন্তু একেবারে সচক্ষে এমন দৃশ্য দেখলে নিজেকে পরম সৌভাগ্যবতী মনে হয় ।

কানহা যেন কেমন করে বুঝিয়ে দেয় পৃথিবী নামের এই বিশাল গ্রহের সৃষ্টি বিন্দুতে মানুষ নেই, আছে অন্য কিছু । এখানে মানুষও যা আর পাঁচটা জন্তুও তাই । মানুষের বিদ্যে বুদ্ধি ছাড়াও কানহার বেশ চলে যাবে । ও সব ছাড়াই কানহা অবর্ণনীয় সুন্দর । ওই বিশাল জঙ্গলের মধ্যে চলতে চলতে নিজের নগণ্যতা বড় হয়ে ধরা পড়ে । আমার জন্মের আগেও যেমন এই জঙ্গল-পাহাড় ছিল মৃত্যুর পরও এই একই ভাবে থেকে যাবে । এই জঙ্গল এক উন্নত সৃষ্টি শক্তির ইঙ্গিত দেয় । সেই ইঙ্গিত নিয়ে আসে এক আধ্যাত্মিক উপস্থিতির কথা ।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য জুলপুর, অনেকে বলেন – জব্বলপুর । আরবি ভাষায় 'জব্বল' শব্দের অর্থ পাথর । জব্বলপুর পাথুরে শহর । শহর থেকে মাত্র ১৪ কিলোমিটার দূরে ভেরাঘাট । গাড়ি এসে থামলো ভেরাঘাটের গেট-এর কাছে । কয়েকটি সিঁড়ি নেমেই নর্মদা নদীর ঘাটে পৌঁছানো যায় । সিঁড়ির দুধারে পাথরের তৈরী জিনিসের দোকান । সাদা মার্বেল পাথরের তৈরী ছোট বড় রকমারী জিনিস । ভেরাঘাট বিখ্যাত মার্বেল রকের জন্য । স্থানীয় মানুষের কাছে গঙ্গার মতো পবিত্র নর্মদা নদী । মার্বেল রক বুক চিরে পথ করে দিয়েছে নর্মদাকে আর নর্মদা তাকে দিয়েছে অসাধারণ ভাস্কর্য । ভেরাঘাটের বড় আকর্ষণ নৌকা বিহার । এখানে এসে নৌকাবিহার না করলে ভ্রমণ সম্পূর্ণ নয় । নৌকা চড়লেই ধরা পড়ে মার্বেল রকের সৌন্দর্য । দুধারে খাড়া মার্বেল পাথরের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে আমাদের নৌকা, নৌকার দু ধারে দুই মাঝি জলে ছলাক ছলাক শব্দ করে দাঁড় টেনে চলেছে । মধ্যিখানে নীল জল আর দুধারে তুষার শুভ্র খাড়া মার্বেল পাথরের পাহাড় । যত ভিতরে যাওয়া যায় পাথর রঙ বদলাতে থাকে । শ্যাওলা ধরা কালচে সবুজ পাথর রঙ বদলে কোথাও সোনালি, কখনও বা রূপালি । মার্বেল শিলা নরম, নর্মদার স্রোতে ক্ষয়ে পাথরে ফুটে উঠেছে ভিন্ন শৈলী । মার্বেল রকে প্রাকৃতিক নিয়মে ফুটে ওঠা এইসব ভিন্ন ভাস্কর্য দেখিয়ে সুর করে মজার ছড়া বলে মাঝিরা । আগে পূর্ণিমার রাতে এখানে নৌকাবিহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল, পূর্ণিমায় চাঁদের আলোয় নাকি এই মার্বেল রক মোহময়ী রূপ ধারণ করে । কিন্তু এখন কতৃপক্ষ সেই নৌকাবিহার বন্ধ করে দিয়েছে । নদীর পাড়ে পুজো আচ্চা, আরতি হচ্ছে, আর ছোট ছোট ৮-৯ বছরের ছেলেরা এখানে এক অবাক কান্ড করে, জলে একটি পয়সা ফেলার জন্য অনবরত আকুতি করে, যেই কেউ পয়সা ফেলে এক নদীর গভীর জলে ডুব দেয় ও মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় করে পয়সাটি তুলে নিয়ে আসে । কি অদ্ভুত জীবিকা এদের ।

কিছুটা দূরেই ধুঁয়াধার ফলস । নর্মদা নদী এখানে জলপ্রপাতের রূপ নিয়ে, পাথরের এক ধাপ থেকে আরেক ধাপে আছড়ে, অনেক নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ছে । তাতে বহু দূর পর্যন্ত ধোঁয়ার মতো জলকণা উড়ছে বলেই এর আরেক নাম 'ধুঁয়াধার' জলপ্রপাত । বৃষ্টির মতো জলপ্রপাতের জলের ছিটে ভিজিয়ে দেয় মুখ হাত । ধুঁয়াধার থেকে মাত্র ১ কিলোমিটার দূরে চৌষট্টি যোগিনী মন্দির । ১০৮ টি সিঁড়ি বেয়ে ওঠার পর সমতল স্থানে এই চৌষট্টিযোগিনী মন্দির । মন্দিরটি, খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে তৈরি, অনেকটা খাজুরাহোর মন্দিরের আদলে তৈরী, মা দূর্গা এবং তার চৌষট্টি জন যোগিনীর উদ্দেশ্যে তৈরী মন্দির । একটি গোলাকার বৃত্তের আকারে চোষট্টিটি মূর্তি স্থাপিত । আর ঠিক তার মাঝে মূল মন্দিরের গর্ভগৃহে শিব দুর্গার মূর্তি । অনেক মূর্তিই মোঘল রাজত্বে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে । কারো মাথা নেই কারো হাত পা উধাও । তবু প্রতিটি মূর্তি যেন এক একটা গল্প বলে যায় । লক্ষ্য করলাম এই চোষট্টি নারীর প্রত্যেকের মূর্তির পাশে আলাদা কোনো জীব বা পাখিও খোদাই করা রয়েছে । কখনো ইঁদুর কখনো টিয়া, কখনো বা হাতি । সকালের সূর্যের মিঠে আলোয় মূর্তি গুলোর অপূর্ব অঙ্গশৈলী যেন বহুক্ষণ দেখলেও মন ভরে না । মন্দির ভ্রমণ শেষ করে গাড়িতে করে কিছুদূর গেলেই রানি দুর্গাবতীর প্রাসাদ ও মদনমোহন ফোর্ট । পাহাড়ি পথে অনেক গুলো সিঁড়ি উঠে গিয়ে ফোর্ট-এ পৌঁছাতে হয় । দুর্গের ভিতর প্রবেশ করে ছোট্ট পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উঠেই চোখের সামনে পুরো শহর । যদি গাছপালা ঘরবাড়ি সব যেন পিঁপড়ের মতন লাগে । আর দেখলাম রক । একটি পাথরের ওপর আর একটি গোলাকার পাথর কেমন অদ্ভুত ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে । দেখলে যেন মনে হয় এই বুঝি ওপরের পাথরটি গড়িয়ে পড়বে, কিন্তু না ওই ভাবেই যুগ যুগ ধরে এভাবেই ওরা দাঁড়িয়ে রয়েছে নিশ্চল, স্থির ।

রাতেই ফেরার ট্রেন । ভ্রমণ এখানেই শেষ । এই কটা দিন যে কি ভাবে কেটে গেলো বুঝতেই পারি নি । দেখার আনন্দে কোনো ক্লান্তিকেই ক্লান্তি মনে হয় নি, বরং ফিরে আসার দিন বারে বারে ভেবেছি আরো যদি কটা দিন বেশি থাকা যেত, আরো একটু যদি বেশি করে জঙ্গল, পাহাড়, মন্দিরে ঘেরা মধ্যপ্রদেশকে অনুভব করা যেত । তখন একটা কথাই মনে হয়েছে — প্রিয় মধ্যপ্রদেশ, জানিনা আবার দেখা হবে কিনা তবে তোমার অনেক স্মৃতি মনে রয়ে যাবে আজীবন ।

আমি মঞ্জিষ্ঠা, পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ায় থাকি, ছবি আঁকতে, গল্পের বই পড়তে ভালোবাসি, পাহাড় খুব প্রিয় । বিশেষ করে হিমালয় । আর পাঁচটা মেয়ের মতই খুব সাধারণ এক মেয়ে । সহজ ভাবে জীবনটাকে দেখতে ভালোবাসি । পুরোনো দিনের মানুষ গুলোর মুখে পুরোনো দিনের গল্প শোনা, হারিয়ে যাওয়া পুরোনো বাঙালী রান্না বান্না শিখতেও খুব ভালোবাসি ।

Editorial

The theme for our March 2018 issue of *Batayan* is love. Love blooms in the first blossoms of spring and sings with the birds building new nests. It renews life and sustains hope in the most difficult times. In "A Choice Less Ordinary" Piya Ganguli portrays an adoptive mother and her children overcoming prejudice. "Falling for the Magician" by M. C. Rydel shows the first enchanted emotions of two people in love.

Love can include forbidden longings, like the fascination with gambling in "All In" by Tinamaria Penn or sweets in Maureen Peifer's "Temptation." It may lead us to the darkest truths to stir our compassion, as in Mita Choudhury's "FROM SYRIA, WITH LOVE FOR DEATH 2016-2018." Or love may transcend personal self-interest and extend to all nature like the Native American reverence for "This Sacred Land of Ours" by David Nekimken. Love connects the perseverance and progress of educators throughout history in "For the Teachers."

We hope you love this spring issue of *Batayan.* Our hearts are here and we thank you for reading.

Jill Charles
Batayan English Editor

Anzac Pride

Balarka Banerjee

40,000 boys on a faraway beach
Were faced with a quarter life crisis
Of staying alive
In faraway and confusing times
Called to fight someone else's war
They carried still this red earth on their boots
They carried this red country in their hearts
And the world on their shoulders
When honour was worth more than life
When what's right was worth more than right now
When the call had to be answered. They did.
Yet, no regret
Except for maybe one
That they could live to see the end
Of the Great War won

But today I fight my battles hard
I fly the flag full mast
I am the defender of my race
I am the progeny of the past
My leaders have taught me
What is best for me
To ever question
Authority is blasphemy
And refugees are the enemy

I know that all art is protest
And what's different is grotesque
I'll show you the Southern Cross
Right here on my chest
TATTOOED…. By a man in Bali

Those pervert gays have no right
If you want a debate, I'll give you a fight
By posting anonymous comments
On a news website
I trust no one with funny names
And people who don't play
My football games
And if you don't wear the same hats as me
You can go back to your own country
Coz we are full
All 2 billion acres

I've been told to keep my defences up.
For an open mind only attracts dirt
And I proudly practice my freedom daily
For freedom is the right to hurt
Media gives me the guns I need
My words are my bullets
Which I can fire at speed
Fire at the speed of thought
If I could only think.

But let us put that aside today
For it's the 25th of April
And I have been drinking my Anzac Spirits since noon
The band is playing Farnesy
And we'll be singing some Barnesy soon
So let us live,
Let us rejoice as one this night
For it's been bought at a very heavy price
And if the dawn breaks, let it break
But only in the name of Anzac Pride

Balarka Banerjee is a Molecular Biologist by profession and an executive in a Biotech company in Sydney. Besides science his other passions are Drama — writing, acting, directing — Poetry and Art. He likes good cinema and music. He is a foodie and a good cook. No wonder he enjoys writing about his experiences and interests.

A Choice Less Ordinary

Piyali Ganguli

Drop by drop the blood trickles down the bottle into the veins of her son's listless body. Megha stares blankly as she watches her son's life ebbing away. Even before the doctor had told her she instinctively knew this was the end; Surjo would not make it this time. She had been preparing herself for this day ever since she brought him home from the orphanage. The thalassemic boy had strangely touched her heart the first time she saw him. Being thalassemic he never stood a chance of adoption. That is what pained Megha the most. And she took her call.

The orphanage authority was not at all surprised at Megha's choice. They considered her an eccentric woman right from the time when a few years back she adopted a dark complexioned girl from their orphanage. Many baby girls were available at that time, fair and reasonably good-looking. But Megha insisted on adopting the darkest and ugliest baby girl. Generally childless couples came to adopt babies. As a single woman coming to adopt a baby, she had already made heads turn and eyebrows raise. Now with her peculiar choice people were convinced that there was something genuinely wrong with her brain. Megha was not unaware of the whisperings behind her back but she chose to ignore them. She knew that the choices she had made in life were difficult and her life would be full of obstacles. But she was game. She was a person who always preferred to follow the path less travelled.

Surjo required regular blood transfusions. Megha's salary as an Assistant Teacher in a Government School though not bad, was not healthy enough to afford a corporate hospital. She had put both Brishti and Surjo to the best schools possible. And she never compromised on their food and nutrition. From story books to colours, from dresses to toys she provided them the best she could. But managing the medical expenses proved to be a little too difficult. Government hospitals were pathetic. Chaotic OPDs, grumpy doctors, careless nurses and a total lack of cleanliness. Every time she had to put Surjo through the ordeal of transfusion she felt she failed as a mother. She could not provide her son a decent medical facility. She started tutoring at home to augment her income but her time was limited. Raising two kids single-handedly left her with hardly any time.

“Ai didi bol na, toke ke ki bolechhe? Ami giye take mere asbo” (Tell me sis, who has hurt you? I will go and bash him up), Megha heard Surjo saying. His little hands wiping off tears from his sister's flooding eyes. It was one evening some years back. Brishti's school was staging Ramayana for some inter-school competition. She wanted to play Sita but her teachers did not even consider her worth auditioning for the role. To make matters worse they selected her as Surpanakha. Megha was initially blind with rage but she knew she had to handle the situation cleverly.

She made an effort: “What a fool you are Brishti! Surpanakha has such a pivotal role. It was because of her that the epic battle was initiated. What role does Sita have other than shedding tears?”

Some more sobbing followed. But gradually she was convinced. Soon the siblings got busy

playing. Brishti had even played her part sportingly and won accolades for her performance, however brief. Episodes like this were more or less frequent. Snide remarks of relatives or biased attitude of teachers were part and parcel of her growing up years. With time and age Brishti learned to tide over these things.

The high school years had their own share of heartbreaks. Most of her friends were dating regularly. Obviously Brishti had no boyfriend. After all, the 'fair and lovely' concept is too deeply ingrained in the Indian psyche. In one particular instance Brishti had taken a fancy for a boy who in turn fell for her best friend. That was a major turning point in her life. Initial tears slowly metamorphosed into a steely resolve. She made it a point to stay away from boys and focus all her energy in academics and co-curriculars. She excelled in both. But her real passion was dramatics. She bagged prizes in almost all inter-school and college drama competitions. So when she decided to apply for the National School of Drama, Megha was not surprised. She had no regret that her daughter was not interested in becoming a doctor or engineer. Rather she was happy that Brishti was trying to carve out a different niche; she had been able to give her daughter a different mindset. Brishti's selection at the National School of Drama gave a fillip to her ambition. She was ready to soar.

Surjo has retired to bed. He has just returned from hospital. Megha was busy with some paperwork. There was a meeting scheduled for the next day. The Council was considering a total revamp of the syllabus and the examination system. Megha knew it was long overdue. A few years back Megha had appeared for the Headmaster's Examination merely to raise her income. But subsequently she was happy to shoulder the responsibilities of her school. As the head of a school her opinion on crucial educational matters carried a lot of weight. The phone rang. At this hour it must be Brishti calling from the US.

“Ma”, Brishti yelled as soon as Megha picked up the phone. “I have been selected for a leading role in a Broadway production,” Brishti was still screaming in excitement.

Megha herself was no less excited. She woke up Surjo and handed him the phone. “Didi ami dekhbo re. Amay niye jabi? (Didi I want to watch it. Will you take me please?)”

Surjo was almost jumping in joy. His ecstatic look suggested what Brishti had responded from the other end. He knew his doting 'didi' would do anything in the world for him. When Brishti got a scholarship from New York School of Drama and left for the US Surjo was inconsolable. Megha had to take a leave from school to spend more time with him. It took a long time for him to adjust to life without 'didi'.

Unlike his 'didi' Surjo was more or less a quiet boy. His health did not permit him many outdoor activities. He spent his leisure poring over story books, a habit his mother had successfully cultivated in both her children. Besides, he had an amazing talent for painting. Prizes from inter-school and state level competitions adorned his little room. On his 10th birthday Megha had surprised him with an exhibition of his paintings at their community hall. The overwhelming response not only encouraged Surjo but his mother as well. She chalked out her future plan of action. She would take him to the Indian Museum and to painting exhibitions held at various art galleries to expose him to different styles of painting. At the next Book Fair she would look out for books on painting. She would do everything possible to nurture her son's talent.

“Madam I am afraid you need to come to school immediately. Surjo needs hospitalization.”

The call came from Surjo's school. Such calls were not infrequent. Being a thalassemia major, Surjo had a number of ailments and episodes of hospitalization were common. He missed school for long stretches. His school was co-operative. Teachers extended their helping hand. Tests were rescheduled. More time was given to him for completing his project work. Megha informed her Assistant Headmistress and made a dash for Surjo's school. Luckily Brishti was in town for a holiday. She had already co-ordinated with the hospital and arranged for an ambulance. Episodes of hospitalization were getting more frequent in recent times. Megha knew what it signalled to. Her 'sun' is going to set.

"Ma, tumi ektu kando, halka lagbe (Ma, please cry a little, you will feel lighter)", Brishti placed her hand on Megha's shoulder. It had just been an hour they have returned from the crematorium. Megha sat clutching Surjo's clothes. Sachin, Sourav, Schumi and Messi were smiling from the walls. The cartoons happily stared from the cupboard. Drawing books and colours lay scattered on the table. The room still smelled of its owner. Brishti hugged her mother, her eyes moist, remembering all the good times they had spent together. Wiping her tears she looked at her mother. There was a complacent look in Megha's eyes.

"No Brishti, I won't cry. Why should I? I am content. I have been able to rescue a child from a life of neglect and give him all the love I could. It is unfortunate that his days were numbered but at least I have been able to fill them with happiness."

Turning to Brishti, she smiled: "You have also grown up to be a wonderful daughter. You are independent, successful and happy. What more do I want? I am a proud mother today. After all, the choices that I made in life did not go wrong."

Piyali Ganguli : She lives in Kolkata, a Teacher by profession. She did her Masters in English from Calcutta University. She enjoys reading, writing and painting.

ALL IN

Tinamaria Penn

Shuffle,
my right hand itched
got my lucky socks on
just this one last time
give me the right cards
remembering the last game
when I took home the pot
got rent to pay
need gas in the car
don't want to go hungry
ain't into borrowing
payday two more weeks away
knots in my stomach
cards I'd been dealt
pretty much nothing
put my poker face on
raised the stakes
gave everything that I got
my chips were all in
hoping no one would call my bluff
don't make me show
just fold
just fold
just fold
my secret prayer
bad feeling ends the game

Tinamaria Penn is a creative word artist and photographer who enjoys finding beauty in the mundane of everyday life experiences. It is Timamaria's aim to record moments in time through written expression and still pictures to help these moments to continue to live through the viewer's interpretation. Tinamaria now resides in Chicago, and her heart stays true to her Cleveland, Ohio roots. Some of her expressions can be found in her first published book, ***Clarity In Three Dimensions*** on Amazon.com

Two Dragons Aflame

Allen McNair

For the Teachers

Jill Charles

Those who inspire teach
Diomitia the philosopher
With Socrates listening at her feet
Minds open like Greek windflowers.

Those who enlighten teach
Plato opened his Academy
To philosopher kings in Athens
And two philosopher queens.

Those who transcend teach
Greek pedagogues were sold in Rome
To teach their masters' children
And Zeus became Jupiter and Plato lived on.

Those who believe teach
St. Brigid at the well of Kildare
Praising God with her sisters and brothers
Weaving her cross out of rushes.

Those who revere teach
Moroccan scholars in Karueein
The first university took notes on creation
From zero to crescent moon.

Those who rule teach
Generations of Chinese scholars
Mandarins under green feather trees
Learned characters for taxes and public charity.

Those who rediscover teach
St. Thomas Aquinas
Reading Aristotle to his class
The world created and renewed.

Those who rebel teach
From the Irish Jesuit in the ring fort
To the black teacher in the slave quarters
Education saves the mind before rebellion frees the body.

Those who respect teach
Maria Montessori in the slums of Rome
Teaching the poorest, the slowest, everyone
To trace their letters and rewrite this world.

Those who know better teach
Rabbi and imam at the podium
In Jerusalem Peace Academy
Rainbow flag on a high school; we are more than he or she.

And I write these lines for you
Because someone taught me.

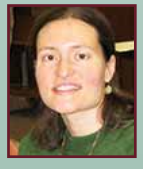

Jill Charles grew up in Spokane, Washington and majored in Creative Writing at Seattle University. In 2007 she moved to Chicago where she writes poetry and fiction and lives in the Albany Park neighborhood. Her career includes nonprofit, academic and legal office work. Jill is co-editor of Batayan, a bilingual literary magazine in Bengali and English. She performs her poetry at open mic nights at The Heartland Café and Royal Coffee. Jill is one of the Chicago Writing Alliance workshop facilitators at Bezazian Library in Uptown. Read her jazz age novel, Marlene's Piano, available from Booklocker.com.

This Sacred Land of Ours

David Nekimken

Iroquois
rights of Nation
to uphold six
U.S. tribes
press Onondaga
activists Mohawk
heritage Cayuga
teach Oneida
elders Seneca
Onondaga Tuscarora
grab indivisible
land bond
settlers peace
promises brotherhood
keeping *a union*
stopped all
sale animal
not for plant
land species
U.S.A all
not elements
borders Mother
recognized Earth
tribes connected
six web of
Nation life
Iroquois Spirit
Washington all
U.S. President people
treaty places
things

Inspired by the documentary file *The Good Mind* at 2017 Peace on Earth Film Festival

David Nekimken is a senior citizen who has been a poet most of his life, with poems published in a few publications. He has a self-published book of poems *Anything and Everything Goes*. He is a grandfather with three wonderful grandchildren. He currently lives in a housing co-op in Hyde Park.

Temptation

Maureen Peifer

It's Friday and I've just come home from third grade. Mom wants me to go to Arfa's Bakery around the corner on Devon and get nine chocolate eclairs for dessert for Sunday dinner. Grandma Peifer, Aunts Jerry, Babe and Cassie are coming.

Arfa's is closed on Saturday- they're a Kosher bakery.

"Oh and pick up six chocolate donuts too," adds Mom, handing me her red leather change purse. "It'll be an extra treat for breakfast tomorrow."

"Great, thanks Mom!" She knows we love Arfa's donuts- they are so cakey, moist and loaded with thick, creamy, CHOCOLATE icing.

The door jingles as I enter and proudly give my order to Mrs. Arfa. "That's extra eclairs, honey," she observes.

"Yeah, grandma and the aunts are coming for Sunday dinner."

"Such a good daughter-in-law your mother is," she says, tying the string on the eclair box and placing the bag of donuts beside it.

"That'll be $8.75, dolly." I hand her a 10 and wait for my change. "There's 9 and 10," says Mrs. Arfa ,"Say hi to the mama."

I balance the white box of eclairs on my arm and carry the donut bag down so I don't risk smashing those gorgeous eclairs. ***I love eclairs!***

It's going to kill me to wait until Sunday to eat one.

Back home Mom puts the treasured box on the top shelf in the fridge and grabs one donut splitting it between us.

"Don't tell your sister and brother," she whispers, washing hers down with a swig of Pepsi while I grab some milk and drink it from my favorite Howdy Doody jelly jar glass.

Saturday and there are the usual chores. Dad takes Marty and Ginny to the park to get them out of the way while Mom vacuums and I dust and polish the furniture.

Lunch - liver sausage sandwiches on rye- Arfa's of course. Ginny naps, Marty and I play board games. Dad goes to Bornhoffen's Market to get the roast beef .

I can't stop thinking about those eclairs. They're whispering my name from the fridge.

Dad takes Marty to get a haircut and Mom is polishing silverware in the living room with her feet up.

I sneak into the kitchen quietly, so quietly, open the fridge and slide that beautiful box out, creeping into the pantry.

I sit on the floor underneath the shelves so that no one can see me. Carefully, I untie the knot- Mrs. Arfa always ties it a certain way- I've watched - and slip 1 eclair out. I lift the treasure, bending it ever so slightly to make a crack in the bottom and insert my pinky to get at that gorgeous thick golden custard. **AHHHH, yes!** One, two, three pinkies full- smooth the thick chocolate frosting on top. No one will ever know.

Maybe just one more! Same deal - crack, pinky, **ecstasy**. Before I know it, I've done all nine! **Oh gosh** - that's okay, I convince myself - no one will ever notice. I arrange them exactly as they had been, redo the Arfa knot and put the box just where it had been on the top shelf.

Sunday afternoon - the roast is in the oven surrounded by potatoes, onions, and carrots. Canned peas are in a saucepan ready to heat on the stove. My brother Marty is popping the can of Pillsbury buttermilk biscuits and arranging them on a cookie sheet while I set the table with the good wedding Rosebud china and silverware, the linen napkins and tablecloth Grandma has embroidered and given us last Christmas.

"Put out the nice water glasses too and the coffee cups on the sideboard for dessert. You know they like their coffee with the eclairs."

"Oh hell the eclairs." I had forgotten. It's okay, no one will notice.

Dinner has ended. Mom has me help bring in the dessert plates, one eclair on each.

Now I'm nervous.

As each fork hits the eclair a slight fart sound emerges from the void where the custard had been. Everyone's fork clinks against their plate since there is no custard to cut through.

" You should take these back Mom. We got gypped!" I blurt out- a little too quickly and way too loudly.

Every head turns and stares at me. My cheeks redden and my head drops and I wish I could disappear like Alice down the rabbit hole except it won't be Wonderland I arrive at - ***I'll probably go straight to hell***.

"Mighty funny they're ***all*** missing the custard," says Grandma Peifer. "Maybe Mr. Arfa was having a bad day."

"How could you forget to put custard in an eclair ?" says Aunt Cassie, Dad's thirteen-year-old sister.

All the while Mom and Dad are staring at me while Ginny and Marty giggle uncontrollably and kick each other under the table.

"I'll have to speak to Mrs. Arfa tomorrow," says Mom quietly.

Dad winks knowingly at me and says "Maybe you should wait until after school, so Maureen can go with you."

Aunt Babe, ever the peacemaker, smiles and quietly intones, "The shells are really crisp and lovely and no one does a chocolate ganache better than Mr. Arfa."

Mrs. Arfa gives me the evil eye next afternoon while asking mom if she would like a refund or nine more eclairs. “I think the refund would be best,” says Mom quietly. “There won't be any eclairs in our home for quite some time.”

I've always suspected Mom went back the next day and returned the money to Mrs. Arfa.

I never admitted I had done it until my 21st birthday party at Mom and Dad's.

Eclairs were served.

Maureen Peifer is a Chicagoan with a lifelong love of literature, writing, travel, and teaching. She is currently the school librarian at a Montessori school where she previously taught. Her summers are spent in Amsterdam, which inspired this poem.

WISHING SHUVO NABABARSHA TO

TO ALL THE READERS AND WRITERS OF

BATAYAN

***

DEBAJYOTI CHATTERJI

SIKHA CHATTERJI

From Syria, with Love for Death 2016-18

Mita Choudhury

Control chaos. Deny refuge.
A catalyst for change in stopped leaky vents?
No guilt in porous wounds and open borders?
Incestuous divides.
Leaks, and bleeds and disappears into mindless cesspools of dried and bloody Union.

Demolish black faces on hearts of darkness.
Mediterranean Blue and white teeth
Forever clenched in agony.

Soporific re-vision.
Memory erased.
Expansive Blue traverse-prone.
Once conquering herds of licentious
Enlightened, gut-wrenching thirst
for distant loot south of Civil. Africa mapped. The Middle defined.
Vanishing points of identity white-washed by waves and returned to imperial filth.

Still thirsty and lust bleeds mice and hollow men and women, not those marooned on islands. Lesbos still rules, priestess of periphery. When all men are dead. The baby's glass stare at the Mediterranean blue.

Mita Choudhury, a tenured professor at Purdue Northwest, is an expert in the cultural history of Britain and has published articles and books on interculturalism, migration, borders, colonialism, and related issues.

Of This, I Relate and I Can't Wait

Allen F. McNair©

To tell of this experience, I cannot wait.
To all my friends I wish to relate
It just happened when I meditate.
Afterwards, I truly feel great.

Meditation helps to settle the mind.
No better means will you ever find.
It is taught by teachers who are certified
By the Teacher's Training Course, so fine.

Enjoyed this practice some forty years
Among a generation of my peers.
For this I am grateful to give many cheers.
This experience of bliss drives out all my fears.

I was peacefully in my meditative thrall.
I felt light as a feather overall.
The next feeling can't be overstated.
For me this time, I felt ever so elated.

I had this shift of body and of mind
As they both began to unwind.
For this experience I remain innocent.
Though in spirit, I feel quite magnificent.

The next moment seemed so very abrupt.
Was I coming down from being up?
Firmly placed in my seat by an outside force.
I continued to meditate to stay the course.

I look forward to twice-daily meditations.
And other experiences of real integration.
Besides endless progress in human relations.
This is only one of many sensations.

And so, as they say, I will take it as it comes.
I can't wait to relate this to my chums.
For me, meditation is so much fun.
And with all of this said, my poem is done.

I, **Allen McNair**, am a self-taught artist and poet inspired daily by the wonders of life around me, and by my present and past experiences. From individual poetic portrayals in my early years of writing, I have graduated to writing and illustrating my self-published epic saga, *I Dream of A 'maresh*.

Falling for the Magician

M. C. Rydel

For the anima and animus in us

He had me with the birds,
Flying in formation around his head,
And disappearing into a golden sack.
Poof! He tosses the empty bag
Into the audience and takes a bow
Magician, hallucinogen, sorcerer.

It's his eyes, really.
Big billboard eyes hanging in a crowded lobby
Of a January lounge filled with pick pockets, tricksters, and hags
Shuffling to their tables and chairs.
Parking lot attendants trailing cold air behind them
When they come inside to take a break.

The candles shiver on our table, the whisky glasses shake,
The dried and brittle flowers in a vase
Stand ready to reanimate scented and luscious.
My perception pauses between possibilities:
A blonde blue-eyed German der Mann or a dark
Brown-eyed Persian mard in a mirror holding a lamp.

I fall for him, the magician, at first sight,
And levitate myself onto his stage,
Cut me in two, suspend me on a pencil,
Sit in the air, the master of space,
Promise me anything, reveal nothing.
Don't ever fear what you never expect to take place.

I must fall deeper and deeper for the magician
As he draws a Queen of Spades from every deck,
As he climbs a rope of scarves of a dozen colors,
As he reads my mind and looks down my dress;
I long for his straight jacket escape,
But see him running through an alley in a cape.

He's all distraction and false impressions.
As he summons the sorcery of slowing time
By measuring moments with the wind and a chime,
And I am so in love with his hypnotizing eyes,
I spiral uncontrolled with his sighs, surprise, deception, and lies
Until the show is over, and we're all out in the cold once again.

She had me with the birds,
Flying in formation around her head,
Disappearing into a golden sack.
Poof! She tosses the empty bag
Into the audience and takes a bow
Magician, hallucinogen, sorceress.

It's her eyes, really.
Enchanted banner eyes hanging in a crowded lobby
Of a January lounge filled with pick pockets, tricksters, and hags
Shuffling to their tables and chairs.
Parking lot attendants trailing cold air behind them
When they come inside to take a break.

The candles shiver on our table, the whisky glasses shake,
The dried and brittle flowers in a vase
Stand ready to reanimate scented and luscious.
My perception pauses between possibilities:
A blonde blue-eyed German die Frau or a dark
Brown-eyed Persian zan in a mirror holding a lamp.

I fall for her, the magician, at first sight,
And levitate myself onto her stage,
Cut me in two, suspend me on a pencil,
Sit in the air, the master of space,
Promise me anything, reveal nothing.
Don't ever fear what you never expect to take place.

I'm falling and falling deeper for the magician
As she draws a King of Spades from every deck,
As she climbs a rope of scarves of a dozen colors,
As she reads my mind and looks me over, as if to undress;
I long for her straight jacket escape,
But see her running through an alley in a cape.

She's all distraction and false impressions.
As she summons the sorcery of slowing time
By measuring moments with the wind and a chime,
And I am so in love with her hypnotizing eyes,
I spiral uncontrolled with her sighs, surprise, deception, and lies
Until the show is over, and we're all out in the cold once again.

Native American Flute History and Use

Patricia B. Smith PhD

Picture yourself sitting in a forest or by a lake enjoying the scenery while in the background are the haunting sounds of a song. The sound permeates your body and mind bringing a sense of repose and serenity. This music is from a Native American flute playing the song of nature.

Except for the Aborigines, almost every culture has two instruments - drums and flutes. The oldest flute is 35,000 years old and is from a cave in Germany. It has five holes, is rim blown and is made of Griffin Vulture bone. Bone flutes in the Americas appeared as early as 296 B.C mainly in South America, Mammoth Cave, KY, Arizona and Arkansas. However, the oldest Native American flute was found in Minnesota by Italian explorer Giacomo Constantino Beltrami in 1823.

Construction:

Over time, the instrument evolved from bone and wood to different materials - usually whatever was available in the area. Flutes are made not only of softwoods, cane and bamboo but also of exotic hardwood, plastic and metal. Multiple tone chamber flutes (called drone flutes) are popular.

The structure of the flutes has had many different configurations - 2,3,4,5,6,7 or 8 holes. In parts of the southern United States, river reed was used to make flutes. These flutes are relatively easy to make and may have contributed to the design of what is commonly referred to as the “plains style flute” which is the type that most flute players use today. The plains flute is longer and has a more brilliant sound. This was so the sound would carry over the great distances of the prairie. The "woodlands style flute" is shorter and softer voiced since it was played in the forest and didn't need to carry over long distances. The original design of the instrument was so advanced that very few changes have been made in the last 150 years or so.

The "traditional" Native American flute was constructed using measurements based on the body - the length of the flute would be the distance from armpit to wrist, the length of the top air chamber would be one fist-width, the distance from the whistle to the first hole also a fist-width, the distance between holes would be one thumb-width, and the distance from the last hole to the end would generally be one fist-width. In between the top air chamber and the whistle is a block so the air is directed over a "cutting edge." Consequently, these flutes were not tuned to any specific scale. Holes would be made and enlarged until the flute sounded good to the maker. Today's flutes are concert tuned so they can be played with other instruments and come in many pitches. There are soprano, alto and bass voiced flutes.

Native flutes and whistles were used for many reasons, usually varying by tribe.

- The Tribes of the Northwest Coast used bone and cedar whistles for different dances and spirit calling ceremonies. Still today, Eagle Bone Whistles are used at many powwows.
- Flutes were used for entertainment by many tribes while traveling; many of these songs still exist today.

- The Hopi Tribe had flute societies that performed powerful prayer ceremonies with their flutes.
- The Lakota Tribes used the flute for courting and love songs.

In the native tradition, the flute represents the sound of the wind; the drum represents the sound of thunder; and the rattle represents the rain. The voice is the lightning that brings light to the music.

Folk Lore:

The story of the origin of the Native American flute is varied depending upon the story teller. The Lakota version is as follows as told by Kevin Locke (Lakota and Anishinaabe) - hoop dancer, Northern Plains flute player, recording artist and educator.

A Lakota hunter was out looking for elk. He had fasted and prayed so the elk would know how important it was to the tribe. In a while, he came across elk tracks and followed them. He followed them throughout the day crossing creeks, climbing hills, and passing through forests. Late in the afternoon, he took a nap. In his dreams, he heard a lovely sound. Upon waking, he could still hear the sound. He followed it and came to a tree where the sound originated. He saw this branch containing holes from a woodpecker. The breeze was gently blowing through it creating the sound. He took the branch back to camp and experimented with it recreating the sound. He learned to play the water, the wind, the earth, the fire, the birds, and other aspects of nature.

The flute is used in ceremonies as well as for courting. According to Kevin Locke, at a certain age, boys and girls were separated and taught specific skills that they would need as adults. They did not talk with one another either so there are even language differences between the genders. Music became the vehicle for communication when courting began. When the girl would finally say something to the boy, he would create a song from the words. Then the song was sung and finally played on the flute often from outside the tent. If the girl likes the song, she would often join in by singing with the flute music. It was the means of connecting.

Playing the flute:

The flute is one of the easiest instruments to play. Instead of "blowing" into it, the player "breathes" into it. No musical experience or talent is needed. Once you learn the basic five-note scale, you are ready to make music. Most of the music that people play is improvisation - playing music that is already inside of us. If you can sing a song, you can play it (no matter whether you can carry a tune or not). The Native American music reflected the birds, the wind, the mountains, hikes, hunts, love, emotions, the seasons, etc. Whatever captured their interest became a song. A song can communicate more than words in many situations.

Many communities and organizations have flute circles where members meet and share their music. They might play a solo or ask others to join them in a duet or combo. Often there will be drums, rattles, singing bowls, gongs, guitars and many other instruments available to embellish the songs if so desired. Some people even have flutes from other cultures to share as well. The World Flute Society website (www.worldflutesociety.org) has lists of flute circles and instructors by state to facilitate sharing music. They may meet weekly, twice a month or monthly.

Health Benefits:

Clint Goss and Eric Miller conducted research to study the effects of playing Native American flutes on a person's physical and mental states. The details of the study are available at www.flutopedia.com. In summary, they found that flute playing significantly enhanced brain activity associated with a meditative state.

One of my flute circles is at a cancer support center as part of the Mind/Body program. I have seen breathing improve in those with compromised lungs, the reduction of anxiety in those currently going through treatment or recently diagnosed, the increase in self confidence with those who had no musical experience, and a lot of smiles in the midst of sadness. Although there is no statistical data to substantiate these observations, they are observable and real to the person.

Personally it stimulates my creative side. Here is a poem that I wrote shortly after learning to play the flute.

Notes

Notes soar like eagles riding the thermals high above the earth.

Notes giggle in laughter and joy like children at play.

Notes cry releasing pain, sorrow, and longing for healing and peace.

Notes dance in your ears reminding you of the joy and delight of life.

Notes softly caress your being lulling you gently to sleep.

Notes for all moods, emotions, experiences in life's journey, and just for being closer to God and nature.

Notes sing through the night carrying love, respect, respite, and joy to others.

Notes transport our souls to their new home after death.

Notes welcome the birth of new life into a world of potential, hope, and growth.

Notes reflect our soul's deepest desires and secrets that words cannot convey.

Notes are the heart and soul of our soul's expression to others.

Notes from within, beyond the mind, beyond the physical into our inner recesses and back out into the universe.

Notes, notes, notes.

So much from just six holes.

So beautiful from nature's instrument of wood.

Even in death, nature's trees communicate to us through notes.

So simple, so beautiful, so heartfelt.

Just simply notes from the soul - our soul, nature's soul, and God's soul to us all.

In summary, the Native American flute has evolved from a spiritual and courting instrument to being reintroduced as a multi-purpose musical instrument. It can be found in bands, orchestras, festivals, weddings, funerals, concerts and many other venues. The sky is the limit for its use. Our imagination is the only limitation.

Patricia B Smith is a retired educator who enjoys playing clarinet in the Naperville Municipal Band, saxophone and clarinet in a ten-piece ballroom band, and flute in a Native American flute trio called Something Different. Something Different creates songs in the style of many world cultures as well as many music genres and has two CDs at CDbaby.com, iTunes and Amazon. She facilitates two Native American flute circles and teaches flute classes at Fountaindale Library in Bolingbrook, IL. She earned a Certificate of Musicianship from Clint Goss' Flute Haven.

With best compliments from

TRIBECA CARE
Eldercare service in Kolkata

You alone can give your parents what they have always given you. Love and attention.
Here's your chance to make them feel like you never left.
No one understands the stress and strain of living away from elderly parents like we do.
Set up by a group of NRIs who faced the same anxieties as you do, Tribeca care offers a range of services that promises grace and dignity to every parent .

Services include but are not restricted to

- 24/7 Helpline
- Doctor House Calls
- Hospital To Home services
- Care Managers
- Customized Packages
- Nursing & Home Care
- Intellectual Companionship
- Home Medicine Delivery
- Home Diagnostic Tests
- Tax filing & Property Management

TriBeCa Care | Bringing Healthcare Home

Read more at : www.tribecacare.com
Follow us on : https://www.facebook.com/TribecaCare
https://www.linkedin.com/company/tribeca-care-pvt-ltd/.

P.S. Please don't generalise us ma'am/ sir!

Arka Ghosh

"Hello! I am Arka Ghosh"

"Sorry?"

"Arka……O…….Au…….Aurko Ghhosshh"

"But, your spelling is Arka…..A…..R……K….A….."

"Yes! I know, but that's phonetics. You see, R-e-n-d-e-z-v-o-u-s isn't Rain-daze-vase but Ron-day-voo"

My introduction, generally, starts like this with any Non-Bengali client/ friends/ colleagues, I meet. And, at the mention of 'phonetics', you get a blank expression and then what follows is just a series of outright generalised words/ phrases/ statements.

"Oh, Yes! You are a Bengali! You do 'O' to otherwise 'Aa'. Right?"

Giving a pitying look to the person, whom I expected to understand phonetics and who defied all my attempts to make him understand, I just mutter an "yes". Then, what follows is even more catastrophic to the ears!

"You people eat fish"

"Rabindranath Tagore"

"Politics has destroyed the city of Kolkata"

"No industries, no jobs"

……and the list goes on.

It's as if Bengalis are just outrightly uncouth, uncivilised and outcasts to this part of the society. But, wait! There's more to us, than what you have just mentioned like, "Bankim Chandra Chattopadhyay – Vande Mataram", Sarat Chandra Chattopadhyay", "National Award Winning Films", "Largest Mangrove of the World - Sunderbans."

I know, it's hard for you to digest all the above mentioned things attached to us and till now, I have covered only Art, Literature and Cinema. I still didn't mention the other several people who are in Science, Academics, Research and Corporate, and I am sure the list will be a good lengthy one.

Coming to our community habits like "eating fish", please grow up people! Europeans do that too and so do other 1.5 billion people globally (Source: greenfacts.org) that is close to 20% of world population or 1/5 of all people living on this planet. So, why stereotype or judge only 0.09 billion people?

Don't know? Right?

I guess, I can formulate a story herein, as to how all of this started. It started something like this…

Ages ago, in the state of Bengal, what comprised of modern-day West Bengal, Bangladesh, parts of Bihar, Odisha and North-East India, there lived a boy called Bhola, in a village by the banks of river Ganga. He used to attend the local village school called "Vidyapith" in the local language. As there was no proper government during those days, and thus, no unnecessary education schemes, the quality of education was really good in these "Vidyapiths" in the villages. So, Bhola learnt subjects like Mathematics, Languages, Social Science, Moral Science and concepts like 'Earth being round', 'plants have life', etc. In his early teens, like any person of his age, with all the curious mindset contained in him, Bhola decided to go and explore the rest of Bengal and a few surrounding areas. His mother, although reluctant initially, gave in to her only son's wish. Bhola went exploring around, gaining knowledge about worldly ways and became a real mature man. Then, he returned to his home and stayed there for the rest of his life imparting his knowledge to the rest of the community through the Vidyapith and speeches in social gatherings.

Now, you must be thinking, why didn't Bhola do something else? Like, getting into the Silk Trade and all. Frankly speaking, I assume it's his innate quality of being a Bengali that he wanted to give back to the society and to serve his own community. It wasn't the 'fish', 'Tagore' or even for that matter 'Rosogolla'. Today, Bholas think of getting into trade after venturing out of West Bengal/ Bangladesh or of securing a job. After all, the state has remained the same in terms of industrialisation. There is still fish in the locality ponds and paddy and other veggies are still grown in abundance to feed on daily basis. But, it's the innate exploring nature of Bhola that he keeps venturing out. And still out of curiosity, he seeks knowledge by surviving in the neighbouring land and sustaining himself and his family by making a living. He seldom returns to his home permanently, but often visits and whenever he does, he regales everyone with his adventurous tales and imparts his knowledge.

Coming back to the folklore……

When Bhola was living in the alien land, he didn't have either access or luxury of a nearby pond or rice-shelter-in-field to satiate his by-nature, by-community staple requirement, absolutely free of cost and in abundance. So, one day at a party of some English Gentleman, he went crazy on being able to discover his staple food in foreign land. But his reaction came in front of Non-Bengalis and they couldn't understand why this Bengali folk is creating such a helluva scene around the banquet table. Bhola danced all around and cried "Fish" and since then, every Bhola is presumed to go crazy for "Fish". But, this is something that came out of Bhola's innate Bengali-ness. And, there are several other things, we can be stereotyped to, for example, 'writing', 'reading', etc. You can refer the list, I provided before starting my mythical folklore of 'Bhola'.

And, there have been many attempts by today's Bholas to get us stereotyped to something else. But, in an attempt to make our community more recognisable through through the names of 'Jhumpa Lahiri', 'Arundhati Roy', 'Amitava Ghosh', etc., we are increasingly recognised through 'Sonagachhi', 'Sheena Bora', 'Dhananjoy Chatterjee', etc. Moreover, "first impression is last impression" and "visibility creates perception" phenomena have made 'fish', 'football', 'Sonagachhi' and 'Sheena' stick to our community.

The only thing associated to us without any prejudice or negative vibe is 'Durga Puja'. So as you see, 'fish' and 'rosogolla' are stuck to us, however hard we try to get us attached with other things which are good aspects and faces of our community.

I know, you must be wondering, while reading all these while, why in the world I thought to write on this topic. Of course, I told you my name's non-phonetic pronunciation by Non-Bengalis along with the stereotypes words/ phrases that follow. But, more than this, there is a section of us, high in number, who have started to ignore our cultural ethos because of non-acceptance in the outer society. They pretend to be non-affected and feel ashamed internally and hence, try attaching themselves and belong to other cultures. (E.g. I have met Bengali surnamed people calling themselves a Delhiite, a Mumbaikar or a New Yorker). Imagine! Two generations down the line don't know anything of their community. This is outright dangerous!

So, here's an open letter to all:

Dear Ma'am/ Sir,

With all due respect,

I would like to request you to stop stereotyping/ generalising us. It's OK, if you don't know about us. But, we aren't all 'fish', 'rice', Tagore and 'rosogolla'. Trust me, you understand this small request being a Non-Bengali. Because, you are ruining our future generations who due to the fear of getting stereotyped and generalised will turn ignorant to our cultural ethos. Result: Extinction of one of the richest cultures and heritages from Earth. And please, don't tell me all is hunky-dory on your side of the world.

Hope, you keep taking pride in our culture and heritage and disseminate it wherever possible via any media, being a Bengali, and thus, in the process, protect and conserve our culture and heritage. Trust me, you in order to project yourself as a modern parent, don't discourage teaching Bengali ethos to your next generation and urge them to do the same, when they become parents.

Yours sincerely,

A Bhola.

A Proud Bengali

But, not a freak! (sic)

P.S.:- Please don't generalise us ma'am/ sir !

Arka Ghosh is a millennial who loves to write, is an avid traveller and a voracious reader. He is currently into corporate after completing his engineering and management studies. He also consults start-ups and is an academic researcher.

Pigeons

Victoria Memorial at dusk